অন্বেষা

নববর্ষ সংকলন

১৪৩১

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

অন্বেষা

নববর্ষ সংকলন

১৪৩১

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

সম্পাদনা
সুধাংশু শেখর পাল ও অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক
এরিকেয়ার

কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন
সি – ৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, কলকাতা - ৭০০০৯৪
ওয়েবসাইট: http://aricare.in/index.php
ইমেইল: aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in
দূরাভাষ: +৯১৯৪৩২২০৯৮৫, ৯৮৩০০৪৪১১০, ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক: মৌসুমী মুখার্জী

সূচিপত্র

কবিতা ৫ - ১৩

বংশীধর মন্ডল, সুধাংশু শেখর পাল, লীলাময় পাত্র, *মুক্তি সাধন বসু* ও শম্পা বসু

গল্প ১৪ - ২৩

গৌতম রায় ও অশোক বিশ্বাস

প্রবন্ধ ২৪ - ৪২

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময় দত্ত, সুধাংশু শেখর পাল, দিলীপ কুন্ডু ও কৃষ্ণেন্দু দাস

ভ্রমণ কাহিনী ৪৩ - ৫৬

কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, মধুমিতা দাশ ও বিনয় কুমার সাহা

রম্য রচনা ৫৭ - ৫ ৯

সুপ্রতীম পাল

স্মৃতি কথা ৬০ - ৬৭ -

তনুরূপা কুন্ডু, মধুমিতা দাশ ও চৈতালি দত্ত

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে আরো একটা বৎসর অতিক্রান্ত হলো; সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষের সূচনা হবে, আর আমরা কালচক্রের কুটিল প্রবাহে ভাসতে ভাসতে নববর্ষের ক্ষণস্থায়ী কিছু মুহূর্তের আনন্দ ও উদ্দীপনার স্বাদ নিতে ব্যস্ত থাকবো। দিনযাপনের গ্লানির মধ্যে মানুষ খুঁজে বেড়ায় কিছু নতুনত্বের। যদি ভাবা যায়; অন্য দিনের মতো নববর্ষও একটা দিন - কাল সমুদ্রের তরঙ্গের এক ক্ষণিক লহমা মাত্র , কিন্তু যা অতি সাধারণ, তা অতি দুর্লভ, কার স্পর্শ, বলে দিতো কানে তুমি মৃত্যুঞ্জয় - ভয় নাহি, ভয় নাহি, তুমি আসিবে নিশ্চয়! এটাই হয়তো মানবজীবনের এক রহস্য। কাল প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নববর্ষ একটা সাধারণ দিনমাত্র। এই সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের প্রকাশ হয়েছে আমাদের আবেগের স্পর্শে, নুতন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ আর অতীতের দুঃখ কষ্ট ভুলে নূতনকে আবাহন করার ব্যাকুলতা ও ভাবুকতার মধ্যে নিহিত আছে নববর্ষ উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা ; নববর্ষ পালনের জন্য আমাদের যে উদ্দীপনা বা উৎসুকতা তা ক্ষনিকের জন্য জেনেও আপামর বাঙালি নববর্ষ পালনে উদ্যোগী হয় ।

বাংলা নববর্ষ বাঙালিদের কাছে একটা বিশেষ দিন। সকালের প্রভাতফেরী থেকে শুরু করে নুতন পোশাক পরিধান, বিশেষ বিশেষ পদ রান্না করে পরিবারে তথা বন্ধু- বান্ধবদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, মিষ্টি বিতরণ, বিভিন্ন মেলার আয়োজন, নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমোদ- প্রমোদ ও উল্লাসে ব্যস্ত দিনটা বৎসরের অন্য দিনের থেকে আলাদা এবং আমাদের আবেগের ছোঁয়ায় অনন্য সাধারণ। যে কোন উৎসব পালনের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও সুস্থ মানসিকতা। আনন্দের আতিশয্যে যেন এই উৎসব পালন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়। বলতে বাধা নেই ; আমরা (বাঙালিরা) যে পথে চলছি - সে কি পথচলা? হিংসা, দ্বেষ, বিভেদ, ধর্মান্ধতা এবং অন্যান্য সামাজিক অবক্ষয়ে জর্জরিত বঙ্গ সমাজ। এই পরিবেশে নববর্ষ বরণ কতটা ফলপ্রসূ হবে সেটা চিন্তার বিষয়। নিরাশায় না ভুগে আসুন আমরা সকলে নববর্ষ পালন করি। এই উৎসবের অনুভূতি যেন আমাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী সুখ ও আনন্দের দিন হিসাবে পরিগণিত হয় আর আমাদের স্মৃতির মনিকোঠায় রয়ে যায় ।

সাহিত্য বিনা কোন উৎসব পালন অসম্পূর্ন। অন্য বৎসরের মতো এ বৎসরও আমরা অন্বেষায় বৈদ্যুতিন সংস্করণ প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছি। যে সমস্ত লেখক, লেখিকার জ্ঞানদীপ্ত আলেখ ও অনুভব বিভিন্ন কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রম্যরচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তাঁদের জানাই অকৃত্রিম অভিবাদন ও ধন্যবাদ। আশা করছি ভবিষ্যতে আমরা অন্বেষা প্রকাশনের জন্য সবরকম সহযোগিতা লাভে ধন্য হবো। এরিকেয়ারের সমস্ত সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জানাই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্পাদকমন্ডলী

মরবো না আর

বংশীধর মন্ডল

সেই যে মরেছিলাম প্রথমবার,

আদৌ বুঝিনি সে আমার এক যাপনের মরণ:

বেঁচে উঠতেই সে কী লজ্জা।

কোন কোন মানুষ মরে অনেকবার,

আমিও মরেছি বারেবারে।

এ মরণ যমের দুয়ারে হত্যা দিয়ে নয়,

সত্যের কাছে দাম্ভিকতার পরাজয়।

দীর্ঘ সময় পার করে নীতিজ্ঞানের অসুখ হল যখন,

দেখি আমি অন্ধ, কখনো অন্ধবধির।

পুনঃর্জন্মে মানুষ নাকি এমনটাই হয়

আত্ম বিশ্বাসহীনতার মৃত্যু দিয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ।

ন্যাকা বোকা শিশুকালে যখন জ্যান্ত ছিলাম,

হয়তো মৃত্যু বীজ বপন করেছিলাম রক্তের ভিতে,

সে ভিতের উপরেই আমি বটবৃক্ষ আজ,

বেদীতে উপবিষ্ট গভীর ধ্যানে মগ্ন আমার মেরুদন্ড।

মৃত্যুদূত প্রদক্ষিণ করে গেছে বেদীমূল বারেবার,

নিথর দৃষ্টিতে উর্দ্ধাকাশে আমি, চোখ ধ্রুবতারায়;

আর কোন মরণের কাজে মানব না হার,

একান্তে আমি তারই প্রত্যাশায়।।

আমি ভালো আছি

বংশীধর মন্ডল

পূর্বায়ণ হতে পশ্চিমায়ণ, হৃদয় বোধ নিয়ে
পা -পা করে আমার দীর্ঘ পথের পরিক্রমা;
বুকের ভিতর আয়ুষ্মান, হৃদয় বত্তায় শঙ্কা,
জটিল কুটিল প্রতিনিয়ত দ্বন্দ,
বিবেক বোধ কখনো পীড়িত অবজ্ঞার আঘাতে,
তবুও সবাই আমার বড়ই আপনজন।

আজ এই আমি, সেই শিশু আমি নই,
দেহ, মন, সুখস্বপ্ন, বিবেক বোধ,
সব বাদ দিলে যা হয়, সে এখন আমি।
নুনের পুতুল নই, চিনির পুতুল অবশ্যই নই,
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী তিথি, আঁধারে বিলীন অতীত,
ভাবী সম্ভাবনার জগৎ আলোহীন,
তবুও পা -পা নিঃশ্বাসে এলো মেলো ঝড়,
তীব্র গতি, কখনো দক্ষিণায়ণ কখনো উত্তরায়ণ,
ধেয়ে আসে অজস্র প্রশ্নের বান, কেবল দেহবাদ;
প্রাঞ্জল ভাষায় দিই সরল উত্তর
"আমি ভালো আছি "

কৌলিন্য

সুধাংশু শেখর পাল

ঘটি না বাটি, শুধোয় প্রতিবেশী
অবাক নয়নে চেয়ে তাঁর পানে
সপ্রেমে তাহারে, কহিলাম আমি
না আমি ঘটি; না আমি বাটি -
আমি হলেম জামবাটি !
জামবাটি ! সকৌতুকে কহেন সুকেশী,
এমন ধারা কথা, শুনেনি বাপের কালে।
আমি কহিলাম, অবাক হলেন ক্যানে ?
জামবাটির নাম শুনে!

জামবাটি এক তৈজসপত্র,
যাহার মধ্যে কেহ নাহি ভরে পত্র
মাখে বাঙালি পান্তা উহার মাঝারে,
অমানির সাথে খাওয়াবে নিজ বাছারে ,
জামবাটি আমি, ঘুরে বেড়াই সদাই।
কখনো পাহাড়, কখনো সমতল,
কখনো চড়াই, কখনো উতরাই।

জামবাটির নাম শুনে
না সিঁটকোও তব নাক,
জামবাটির মাহাত্ব যদি শুনো
ঘুচে যাবে তোমার সকল বাঁক
জামবাটি যে বিশেষ বস্তু
করবে কেন তুমি কিন্তু কিন্তু।

যদি পাও জামবাটির সহারা

দিবে ও তোমায় দিনরাত পাহারা

পাইবে শান্তি দ্বিধাগ্রস্থ মনে

স্বস্নেহে টানবে তুমি আপন পানে।

পাদটীকা :

আমানি : গাঁজন(fermentation) প্রক্রিয়ায় তৈরী পান্তা ভাতের জলীয় অংশ, এটা খনিজ লবন যেমন লৌহ,দস্তা, পটাসিয়াম, ভিটামিন D ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ, বলকারী এবং পোষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

তৈজসপত্র : সাধারণতঃ পিতল বা কাঁসার বাসন

সহারা : এটি একটি হিন্দী শব্দ, যার বাংলা প্রতিশব্দ সহযোগিতা, বিপদের বন্ধু

পদসেবা

সুধাংশু শেখর পাল

পদসেবা, মহান সেবা করে সর্বজনে,
করলে সেবা, পাবে মেবা , কহে বিজ্ঞজনে।
পার্বতীর পদসেবা করেন মহাদেব ,
লক্ষ্মীর সেবাধন্য হন হরিদেব।
ইন্দ্রানী আদি দেবীগণ পান পদসেবা ,
এ সবই বিধিন বিধান, অন্যথা করে কেবা।
প্রিয়তমা পায় প্রিয়ের সেবা, হলে মহারুষ্ঠ,
মিটি মিটি হাঁসে ওরা, হয় যাহারা মহাদুষ্ট।
নেতার সেবায় লিপ্ত যে জন, মুক্ত সকল বন্ধন হতে,
মাভৈ, মাভৈ, নাও সবই লুটে, করে কেল্লাফতে।
চাটুকার এক লাগায় মলম, বড় নেতার পায়ে ,
বড় ভয় লাগে, যদি লাগে চোট,
যখন হাঁটবে ডাঁয়ে বাঁয়ে।
পদসেবা করা মহা কষ্টকর,
দিতে হয় সবে পাহাড় প্রমান কর।
বৌ -ছেলে ছেড়ে, যেতে হয় দৌড়ে,
আছে কি বিশেষ পথ, পদসেবার হুড়ে ।
কেঁদে কেঁদে হয় সারা, সকল ভ্রমরা
কেমনে করিবে মধুপান, হয়ে মনমরা
পদসেবার তরে হয়েছো যখন চাতক !
কৃপাদৃষ্টি, হয়ে বৃষ্টি ঝরিবে কি তবে ওষ্ঠে?
মিলাইবে কি তুমি সব যোগ-বিয়োগ ,
মনের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা, আর কত দুর্ভোগ।

পঁচিশ বছর পেরিয়ে এলাম

লীলাময় পাত্র

কি আবেগে ছুঁয়ে আছে হৃদয়
সেই মেঘলা আকাশ,
পঁচিশ বছর পেরিয়ে এলাম ,
সেই সারাটাদিন
তার অনুরণন বলে -
' ' আমার সারাটাদিন
মেঘলা আকাশ
বৃষ্টি তোমাকে দিলাম ' ' ॥

হৃদয়ের জানালাটা
আজো খোলা রাখি ,
বাতাসের বাঁশিটা
আজও বাজে নাকি !
সেই বৃষ্টি দিন
অগণন হৃদয়ে
আজ ফিরিয়ে দিলাম ! !
' ' আমার সারাটাদিন
মেঘলা আকাশ
বৃষ্টি তোমাকে দিলাম ' ' ॥

সবার হৃদয়ে সেই
রাত্রি রচনা ,
রাত জাগা চোখ জুড়ে
সেই একই ভাবনা ,
সেই বৃষ্টি রাত আবার
নিবিড় করে
ফিরে চাইলাম ! !
' ' আমার সারাটাদিন
মেঘলা আকাশ
বৃষ্টি তোমাকে দিলাম ' ' ॥

ভাল নেই দেশ

মুক্তি সাধন বসু

মানুষেরা ভাল নেই এ সংসারে
ক্রমাগত কৃষ্ণপক্ষ অস্তিত্ব আঁধারে
অস্থি চর্মসার দেহ, জঠরে আগুন
দারিদ্রের কক্ষপথে দীর্ঘ পরিক্রমা
মঙ্গল গ্রহতে অমঙ্গল নিয়ত প্রলয়
জীবনের ভীত নড়ে কপালে ফাটল।

মানুষেরা ভাল নেই নতুন ভারতে
পান্ডবেরা বনবাসে, কৌরব প্রাসাদে
সম্পদের সিংহভাগ শাসকের ভোগে
নারায়ন উপবাসী ঘরে, বিগ্রহ মন্দিরে
অচৈতন্য মানুষের ভীড় চৈতন্য সাগরে
মাটিতে মূল্যবোধ, গঙ্গায় ভাঙন।

দেশব্যাপি ভাল নেই তরুন সমাজ
কালের কপাল জুড়ে দীর্ঘ ফাটল
ভাগ্যরেখায় ধ্বস, ধুলায় রাত্রিবাস
মৃত অনুভুতি, নেভা দীপ স্বপ্ন প্রদীপ
কারাগারে অন্ধকারে নতুন প্রজন্ম
দুর্বলেরা পীড়িত দুর্বিসহ জীবন সংগ্রামে।

শুনেছি এ পৃথিবীতে ভাল নেই কেউ
বাতাসে সংক্রমণ, বিপন্ন সবুজ
জলবায়ু আবহাওয়ার অস্তিত্ব সঙ্কটে
নিষ্ক্রিয় মৌসুমীবায়ু, বৃষ্টিহীন দিন
মাটিতে উত্তাপ বাড়ে, সুখ পোড়ে
মুখ পোড়ে মানুষের, মৃত ফসলের।

ভালো নেই মহাকাশে সূর্য গ্রহ চাঁদ
পৃথিবীর মানুষের অকারন অতিক্রমন
লজ্জাবস্ত্র হরণের খেলা মহাভারতের
দ্রৌপদীরা কলঙ্কিত, চাঁদের মাটিতে
দানবের দাপাদাপি, বিপন্ন অস্তিত্ব
বৈধ সত্ত্বার বুকে অবৈধ বিচরণ।

মূল্য

শম্পা বসু

গুনের মূল্য?

তা শুধু গুণীর কাছে।

বুদ্ধির মূল্য?

তা শুধু জ্ঞানীর কাছে।

কর্মের মূল্য?

তা শুধু কর্মীর কাছে।

ভালোবাসার মূল্য?

তা শুধু প্রেমিকের কাছে।

সৌন্দর্যের মূল্য?

তা তো তাৎক্ষণিক।

জীবনের মূল্য?

সবার কাছে।

সত্যিই কি তাই?

শুধু আমার মূল্য নেই

বোধহয় কারোর কাছে।

গল্প

নোলক

গৌতম রায়

বাসটা আজ কেন যে এতো জোরে চালাচ্ছে এটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। অমলের চায়ের দোকানের স্টপেজ থেকে বাসে উঠতেই হটাৎ একটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে বাসটা চলতে শুরু করল। সিদ্ধার্থ তো টাল খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল। যাই হোক, কোনোমতে একটা জানলা ধরে টাল সামলে ও নিল। মনে হয় পেছনে আর একটা বাস ওই একই দিকে আসছে এবং বেশ কাছাকাছিই এসে গেছে। তাই হয়তো আজ এর এতো তাড়া।

বাসটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। পরের স্টপেজেই সামনের সিটটা ফাঁকা হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ বসে পড়ল। শেষ হেমন্তের দুপুরে রোদের চড়া ভাবটা খুব একটা খারাপ লাগছে না। বাসটা জোরে জোরে যাচ্ছে বলে একটা বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে আসছে। বেশ ঘুম ঘুম একটা পরিবেশ। সিদ্ধার্থ তো বাসে উঠে একটু বসার জায়গা পেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়েও যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের চটকাটা ভেঙে লজ্জা লজ্জা মুখ করে আশেপাশে একবার দেখে নিয়ে, যতই জেগে থাকার চেষ্টা করুক না কেন, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। একবার তো পাশে বসা লোকটা এরকম একটা সুযোগ পেয়ে ঢুলে পড়ার মুহূর্তে আরো একটু ঠেলে দিয়েছিল ওকে, ফলে - একেবারে সিট থেকে বাসের দাঁড়াবার জায়গায় পড়ে গিয়েছিল ও। সে কী লজ্জা, কী লজ্জা! বাসের অন্যান্য লোকজন হা হা করে হাঁসছে, নানারকম ব্যাঙ্গ করছে। কিন্তু কিছুই তো করার নেই তখন। বোকা বোকা মুখ করে পরের স্টপেজেই নেমে যেতে হয়েছিল সেদিন। তারপর থেকেই ও খুব চেষ্টা করে বাসে না ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু কিছুতেই সেটা পারে না। ঘুমিয়ে পড়েই। আজ ও তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না।

কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা কিছুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখানে - ওখানে ঘোরাঘুরি, আড্ডা, সিনেমা দেখা - এসব নিয়েই দিন কাটছে এখন সিদ্ধার্থর। একটা চাপা দুশ্চিন্তাও আছে ওর, একটা পেপার ঠিক মতো হয়নি কিন্তু এটাও তো ঠিক বৃথা চিন্তা করে এখন আর করবেই বা কী! যা হবার - তা তো হবেই। তাই এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না!

নিউ এম্পায়ারে একটা গ্রেগরী পেক এর সিনেমা এসেছে। অনেকদিন ধরেই ও ঠিক করছে - সিনেমাটা দেখতে হবে। কবে বলতে কবে উঠে যাবে - তখন মুশকিল! আর দেখাই হবে না। তাই কদিন ধরে ও রিমলু, নিশীথ, মানিক, পিন্টুদের বলছে , একটা দিন ঠিক করতে, সিনেমাটা দেখতে যাবার জন্যে। কিন্তু

কিছুতেই তাদের সময় হচ্ছে না, তাই আজ একাই বেরিয়েছে, খাওয়া দাওয়া সেরে তিনটার শো এ সিনেমাটা দেখবে বলে।

বাসটা আরো জোরে যেতে শুরু করেছে, ওভারব্রিজে উঠছে। এখানে আর কেউ উঠবে না। তাই আরো স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে এবার বাসটা।

ব্রীজ থেকে নামার সময় হটাৎ কি যে হল, চোখের পলকে সবাই ছিটকে পড়ে গেল সিট ছেড়ে, সিদ্ধার্থও পড়ে গেল ঘুমের চটকা ভেঙে। বাসটা যেতে যেতে হটাৎ মনে হয় ব্রেক ফেল করে ওভারব্রিজের দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে। দেওয়াল ভেঙে বাসের মুখটা একটু বেরিয়ে আছে শূন্যে।

বাসের মধ্যে কান্নার রোল উঠেছে, কারোর হাতে লেগেছে, কারোর পায়ে। কারোর বা আবার মাথায় লেগেছে। একদম পেছনের সিটে বসা এক ভদ্রলোক সোজা ড্রাইভারের পেছনের গরাদে ধাক্কা মেরেছে জোরে।

প্রাথমিক আকস্মিকতা কাটিয়ে সবাই এবার বাসের পেছনের গেট দিয়ে নামতে ব্যস্ত হয়ে গেল। মোটামুটি সবাই নামল, সিদ্ধার্থও হাতে যন্ত্রণা নিয়ে নামল। বেশ ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে সেখানে। সবাই ড্রাইভারকে চিৎকার করে বকাবকি করে চলেছে। নির্বিকার ড্রাইভার অনেক কায়দা কানুন করে নীচে নামল। ওর সিটটা তো শূন্যে ঝুলছে। নামার পরে সবাইকে চিৎকার করে বলল

- আরে আমাকে গালাগালি পরে দেবেন। ভেতরে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আগে নামান ওনাকে।

দু - একজন উঁকি -ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু আবার কারোরই ওই ঝুলন্ত বাসের ভেতরে উঠতে সাহস হল না, বরং ভিড়টা আস্তে আস্তে বেশ ফাঁকাই হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থর ভেতর হটাৎ যেন এক ঘুমিয়ে থাকা বীর জেগে উঠল। পেছনের গেট থেকে খুব সাবধানে উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখল এক মহিলা পড়ে আছেন ওখানে। জ্ঞান নেই কিন্তু শ্বাস পড়ছে। একা একা ওনাকে নামাবে কী করে? অবশেষে সেই ড্রাইভার , কন্ডাক্টর আর সিদ্ধার্থ মিলে সেই মহিলাকে একেবারে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে রাস্তার ফুটপাতে শুইয়ে দিল। একজন হটাৎ তার কাছে থাকা জলের একটা বোতল এগিয়ে দিল। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া শুরু হল। একটু যেন চোখের পাতাটা নড়ে উঠল মনে হল এবার।

সিদ্ধার্থর মনে হল মেয়েটির বয়স বেশি নয়। হয়তো ২০/২২ বছর বয়স হবে । গায়ের রং বেশ কালো। তার ওপর নীলচে রঙের একটা খুব সাধারণ সূতির শাড়ি পরে আছে। দুহাতে দুটো সরু সরু হলদে রঙের চুড়ি। সোনা বলে মনে হয় না, পেতল বা ইমিটেশন হবে হয়তো। সেরকমই দুটো দুল আছে দুকানে, কিন্তু নাকের মাঝখানে একটা - মনে হয় সোনার, খুব সুন্দর নোলক ঝুলছে। হাতের মুঠোয় ধরা একটা ছোট্ট মানি ব্যাগ।

জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরল মেয়েটির। তারপরেই চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। ইশারায় বোঝাল ডানপায়ে ভীষন যন্ত্রণা হচ্ছে। নাড়াতে পারছে না।

যে কয়েকজন তখনও দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল আর নানারকম রোগের সম্ভাবনার কথা বলছিল - তারা এবার সমস্বরে বলতে শুরু করল --- ওর তো পা ভেঙে গেছে। এখুনি ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে ট্যাক্সি কোথায়? ট্যাক্সি? ট্যাক্সি....এই ট্যাক্সি...।

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটাকে আবার ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে সিটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তার পরেই মুশকিল হল - কেউই আর ওর সঙ্গে হসপিটাল যেতে চাইল না। প্রত্যেকেরই সেই মুহূর্তে মনে পড়লো প্রচুর কাজের কথা। সিদ্ধার্থ ভাবল - আজ না হয় নাই বা সিনেমাটা দেখা হল। অন্যদিনেই না হয় যাব। আজ এই মেয়েটাকে এইভাবে ছেড়ে যাওয়াটা একেবারেই উচিত হবে না। আর অন্য সবারই যখন অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে, ওরই একমাত্র সেরকম কোনো দরকারি কাজ নেই, তাই যাওয়াটাই উচিত। কিন্তু সমস্যাটা তো অন্য জায়গায়। পকেটে যেটুকু টাকা আছে তাতে ট্যাক্সি ভাড়াটা না হয় কোনোমতে হয়ে যাবে, কিন্তু তারপর? ওষুধপত্র নিশ্চয়ই কিনতে হবে। সেগুলোর কি হবে?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মেয়েটি তখন পিছনের সিটে শুয়ে শুয়ে চিৎকার করে কেঁদে চলেছে।

ট্যাক্সি এসে পৌঁছল পিজি হসপিটালের এমার্জেন্সির সামনে। সিদ্ধার্থ নেমে তাড়াতাড়ি ছুটে একটা ট্রলি নিয়ে এল। সেই ড্রাইভারের সাহায্যে দুজনে মিলে ট্রলিতে নিয়ে সিদ্ধার্থ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে গেল এমার্জেন্সির ভেতরে।

চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে খাতায় সই করতে হল সিদ্ধার্থকে। ডাক্তারবাবু বললেন একটু অপেক্ষা করুন। যদি ভর্তি করতে হয় - ভালো, নয়তো বাড়ি নিয়ে যেতে হবে পেশেন্টকে।

যেন অন্তহীন অপেক্ষা শুরু হল তারপর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, তারপর সন্ধ্যে। একটু একটু ঠাণ্ডাও লাগছে এবার। একবার বাইরে গিয়ে চা ও খেতে পারছে না সিদ্ধার্থ। কি জানি - যদি ঠিক সময়েই ডাক্তারবাবু ডাক দেন। চুপি চুপি চলে যেতেও পারছে না, কি জানি ওই গরিব, শীর্ণকায় মেয়েটার ওই সরল নিষ্পাপ মুখটায় কিরকম যেন মায়া পড়ে গেছে ওর। মেয়েটা সম্বন্ধে কত কি চিন্তাও আসছে মাথায়। ও কোথায় যাচ্ছিল, কোথা থেকে আসছিল, কে কে আছে ওর? কোথায় বাড়ি - কিছুই তো জানে না ও। কিন্তু তবু যেন মনের ভেতর থেকে কেউ বলতে থাকল এই অবস্থায় ওকে একা এভাবে ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এ ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

হটাৎ ভেতর থেকে ডাক্তারবাবুর ডাকে সম্বিত ফেরে সিদ্ধার্থের। ও ভেতরে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন - খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। মেয়েটির পা টা ভাঙেনি। তবে খুব জোর লেগেছে। যা কিছু ইঞ্জেকশন এবং ব্যথার ওষুধ দেওয়া হয়েছে। সাবধানে ওকে বাড়ি নিয়ে যান। শুইয়ে রাখুন।

মেয়েটার মুখের যন্ত্রণার ছাপটা এখন আর নেই। ওকে একটু ধরতে নিজেই উঠতে পারল তারপর সিদ্ধার্থের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। সিদ্ধার্থ তার শক্ত হাতে তাকে বেষ্টন করে থাকল।

- তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলে?

মেয়েটি চুপ। বারবার প্রশ্ন শুনে অবশেষে বলল –

- আমার নাম শম্পা। বাড়ি সেই আমতায়। আমার দিদির বাড়ি পূবপাড়ায়, ওখান থেকেই বেরিয়েছিলাম তখন।

- কোথায় যাচ্ছিলে?

- ঠিক জানি না। এমনিই বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার সৎ মা বকাবকি করল বলে রাগ করে কাল রাতে দিদির বাড়ি চলে এসেছিলাম। কিন্তু নিজের সেই দিদিও যা বলল - যেদিকে দুচোখ যায় তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার তো মরে গেলেই ভালো হত, আপনি আমায় বাঁচালেন কেন?

সিদ্ধার্থ দেখল - মেয়েটির চোখ থেকে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে। মুখে কালো অভিমান। কোনো কথাই আর বেরুচ্ছে না তখন তার মুখ থেকে।

- বুঝলাম। তুমি কিছু খেয়ে বেরিয়েছিলে? কিছু খাবে তো? বলো? চুপ করে আছো কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শম্পা বলল –

- না, কাল রাত থেকেই কিছু খাওয়া হয়নি।

বড়ো বিব্রত লাগল সিদ্ধার্থর। পকেটে মাত্র কয়েকটা টাকা পড়ে আছে। এখন ওকে কী করে খাওয়াবে সে? পেট ভরা খাবারের মতো টাকা তো কোনোভাবেই হবে না ওর কাছে। তাছাড়া সেই দুপুরের পর থেকে তো ওর নিজেরও কিছু খাওয়া হয়নি। তবে? কী করা যায় তাহলে?

শম্পা বোধহয় সিদ্ধার্থর মনের কথাটা বুঝতে পারল, বলল -

- এখন কিন্তু আমি কিছু খাবো না, শুধু একটু চা খেতে পারলে ভালো হয়।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে এল হাসপাতালের বাইরে ফুটপাতের চায়ের দোকানে। তারপর টিফিন কেক আর চা কিনে খেল দুজনেই।

কোথায় যাবে এখন তুমি? কোথায় তোমায় ছাড়ব? তুমি তো একা মোটেই যেতে পারবে না। অবশ্য আমি তো সেই আমতা নিয়ে যেতেও পারব না তোমায়! দিদির বাড়ি গেলে দিয়ে আসতে পারি।

- আমি কোথাও যাব না। আপনি আমায় এখানে রেখে চলে যান, আমি এখন ভালোই আছি।

- তোমার কি মাথা খারাপ? এখনই দেখছ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর একটু পরেই দেখবে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে যাবে। তুমি একলা মেয়ে, এখানে থাকবে কী করে? কী খাবে? এটা কিন্তু কলকাতা শহর। রাতে একলা একটা মেয়ের পক্ষে মোটেই এটা ভালো জায়গা নয়। আর তাছাড়া তোমার দিদিও হয়তো চিন্তা করছে এখন তোমার জন্যে। একদম পাগলামি কোরো না। চলো, তোমায় তোমার দিদির বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রায় জোর করেই মেয়েটাকে একটা ফাঁকা বাসে তুলল সিদ্ধার্থ। লেডিস সিটে শম্পাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। টুকটাক কথাও বলতে লাগল।

ঘন্টাখানেক পর পূবপাড়ায় বাস থামল। আবার ধরাধরি করে ওকে বাস থেকে নামল সিদ্ধার্থ।

- এবার কোথায়? কোন দিকে তোমার বাড়ি? হাঁটতে পারবে?

বোঝা গেল, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে এবার। শম্পার পক্ষে মোটেই হাঁটা সম্ভব না। তাই একটা সাইকেল রিকশায় উঠতে হল। প্রায় অন্ধকার পথে সেই অজানা অচেনা দীনহীন মেয়েটাকে ধরে বসে থাকতে থাকতে সিদ্ধার্থর ভীষন মায়া হল মেয়েটার জন্যে। বারবার তাই ও বোঝাতে লাগল মেয়েটাকে –

- এত সহজে ভেঙে পোড়ো না। মেয়েদের কত কী করার আছে জীবনে। তুমি দেখবে, একটা না একটা কিছু ঠিকই পেয়ে যাবে কাজ। তখন নিজের পা-এ দাঁড়িয়ে তুমি ভালোই থাকবে। তখন ওই সৎ মার কাছেও ফিরতে হবে না তোমায়। দিদি, জামাইবাবুরও কোনো কথা শুনতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে। এখন একটু মেনে নাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

- এই ভাই দাঁড়াও। এই এখানে। হ্যাঁ ডান দিকের ওই বাড়িটা দিদির।

আবার সাবধানে নামতে হল শম্পাকে। রিকশা চলে গেল। শম্পা ভেতরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়াল। তারপর সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বলল –

- দেখুন আপনাকে আমি চিনি না, কিন্তু আপনি আমার জন্যে আজ যা করলেন - তা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না। আমার জন্য আপনার অনেক টাকা পয়সা খরচও হয়ে গেল। কিন্তু দেখুন, আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই। শুধুমাত্র আমার মার রেখে যাওয়া এই সোনার নোলকটা আছে। এটা আপনাকে নিতে হবে। না বলবেন না।

- কি বলছ তুমি শম্পা? তুমি তো দেখলে তোমার জন্য আমার সেরকম কিছু খরচ হয়নি! তুমি সারাদিন না খেয়ে আছো, সেটা জেনেও আমি তোমায় ভালোভাবে খাওয়াতে পর্যন্ত পারলাম না কোনো ভালো দোকানে। আর তুমি বলছ যেটুকু করতে পেরেছি তার জন্য তোমার মায়ের একমাত্র স্মৃতি - ওই সোনার নোলকটা আমায় নিতে হবে? বল কী তুমি? এ আমি কিছুতেই পারব না। তুমি ঘরে যাও, আমি আসছি।

- না না, এটা আপনি নিন। আপনার আজ অনেক ক্ষতি করে দিলাম আমি। সারাদিন সময়টাও নষ্ট হল আপনার। কিন্তু কী করবো বলুন? আমার কাছে শুধু বাস ভাড়াটা ছাড়া তো আর কিছুই ছিল না। থাকলে -

আর কোনো কথা বাড়াল না সিদ্ধার্থ। ওই গ্রাম্য মেয়েটির সরলতায় কিরকম যেন - একই সঙ্গে কষ্ট আর ভালো লাগা মিলেমিশে শরীর আর মনকে আপ্লুত করে দিচ্ছে। গলাটা কিরকম যেন বুজে আসছে। কথা বেরুচ্ছে না যেন আর।

সিদ্ধার্থ শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল –

- না, যাও তুমি ভেতরে। একদম না। মায়ের দেওয়া ওই স্মৃতি কিছুতেই নষ্ট করবে না তুমি। যাও, ভেতরে যাও।

আর কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়েই সিদ্ধার্থ পেছন ফিরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যেতে থাকল অন্ধকার গলি পেরিয়ে আলোকময় বাস রাস্তার দিকে। কিছুতেই ওর চোখের জল দেখতে দেওয়া যাবে না ওই সরল গ্রাম্য মেয়েটাকে। কিছুতেই না।।

অণুগল্পত্রয় - সেই রাতে, জীবন-মৃত্যু এবং ক্যামেরা

অশোক বিশ্বাস

সেই রাতে

স্বল্প পরিচিত শহর গোবরডাঙ্গার রেল স্টেশনে পৌঁছাতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল ব্রজকিশোরবাবুর। অনেকগুলো ক্রসিং হওয়ার পর দুটো স্টেশনের আগে ট্রেন সিগনালেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই এতো দেরি। আজ পুরোনো অফিস কলিগ নগেনবাবুর মেয়ের বিয়ে। একমাত্র সন্তানের বিয়েতে পইপই করে তাকে আসতে বলেছিলেন, ফেলতে পারেননি তিনি। ব্রজকিশোরবাবু রেলের চাকরি থেকে বছর পাঁচেক আগে রিটায়ার করেছেন। নগেনবাবু তার সেকশনে কাজ করতেন, তাই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। বারো বছর পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করেছেন তারা।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন ব্রজকিশোরবাবু, কোনো রিকশা বা অটো নেই। শীতের রাতে সাড়ে দশটা মানে অনেক রাত এই মফস্বল শহরে। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল, খোঁজ নিতে দোকানদার জানালো এখন আর কোনো রিকশা বা অটো পাওয়া যাবে না। ঠিকানা বলতে সে একটা শর্টকার্ট রাস্তা বলে দিলো। অগত্যা মনে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে দোকানদারের বলে দেওয়া রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ফোনে চার্জ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি, সেটা এখন অফ হয়ে গেছে। তাই নগেনবাবুর সাথে যোগাযোগ করারও উপায় নেই।

গোবরডাঙ্গা অনেক পুরোনো শহর, শিক্ষা সংস্কৃতিতে অন্য অনেক শহরের থেকে এগিয়ে। এখানকার লিচু ও অন্যান্য ফলের সুনাম আছে এ অঞ্চলে। কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে মিনিট দশেক হাঁটার পর ব্রজকিশোরবাবু লক্ষ্য করলেন রাস্তার আশেপাশের বসতি হালকা হয়ে এসেছে। রাস্তার এক পাশে চাষের মাঠ , অন্যদিকে আম ও লিচু বাগান, মাঝে মাঝে দুই একটা বাড়ি রয়েছে অস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে। শীতের রাতে সাড়ে দশটা এগারোটা মানে গ্রাম অঞ্চলে অনেক রাত। তাই কোনো বাড়িতেই এখন আলো জ্বলছে না।

অজানা অচেনা এই এলাকায় তিনি নতুন, তাই একটু ভয় পেয়ে গেলেন ব্রজকিশোরবাবু। আশেপাশে চাষের মাঠ, ডোবা রয়েছে, তাই সাপ-খোপ থাকাও অসম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সতর্ক ভাবে চলতে লাগলেন তিনি। মনে হতে লাগল চায়ের দোকানদারের বলে দেওয়া এই রাস্তায় না এলেই বোধহয় ভালো হতো। মূল রাস্তা দিয়ে এগোলে ভ্যান রিকশা বা অন্য কোনো যানবাহন পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভবনা থাকতো। আরো কিছুটা এগোনোর পর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। অন্ধকার রাতে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে । তাই আর এগোনো ঠিক হবেনা ভেবে একটা আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলেন ব্রজকিশোরবাবু। খানিকটা এগিয়ে পিছিয়ে মরিয়া হয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা ভাঙা ঝুপড়ি দেখতে পেলেন। দেখে মনে হল পুরোনো কোনো দোকানঘর। বৃষ্টি না থামলে আর এগোনো যাবে না তাই সেখানেই দাঁড়ালেন।

দু ঘন্টার ট্রেন জার্নি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ভাঙা ঝুপড়ির ঝুরঝুরে মাটির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোতে লাগলেন। কিছুক্ষন পরে সামান্য আওয়াজ কানে এল। ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা গেল, কেউ এদিকে এগিয়ে আসছে। ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এলেন ব্রজকিশোরবাবু। একটু অপেক্ষা করতেই একটা অল্প বয়সী ছেলের দেখা পাওয়া গেল। ভারী সুন্দর

দেখতে মায়া মাখানো মুখ। বয়স বড় জোর বাইশ তেইশ বছর হবে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন ব্রজকিশোরবাবু। বৃষ্টিও এখন একটু কমেছে। তিনি তড়িঘড়ি নগেনবাবুর ঠিকানা বলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। ছেলেটি কোনো উত্তর দিলোনা শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলল। বৃষ্টিভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় যতটা সম্ভব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ছেলেটাকে অনুসরণ করতে লাগলেন তিনি।

কিছু সময় পর গ্রামের মাটির রাস্তা পেরিয়ে ইটের রাস্তা পাওয়া গেল। ছেলেটি এতটা সময় কেটে গেলেও কোনো কথা বলেনি, নিঃশব্দে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। ভারী ভালো লাগল ব্রজকিশোরবাবুর ছেলেটির ব্যবহারে। ইঁটের রাস্তায় পৌঁছনোর পর তিনি দেখলেন আশেপাশে কিছু কিছু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটু এগিয়ে একটা গলির দিকে ইঙ্গিত করে ছেলেটি চলে গেল। গলি ধরে কিছুটা এগিয়ে নগেনবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছিয়ে গেলেন তিনি। শীতের রাতেও বিয়ে বাড়িতে এখনো অনেক লোকজন রয়েছে। খবর পেতেই নগেনবাবু দৌড়ে এলেন,. বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। ডেকে ডেকে আত্মীয়স্বজন ও মেয়ের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিয়ের লগ্ন মাঝরাতে, নগেনবাবু তাই কন্যা সম্প্রদানের জন্য এখনো বসেননি। দেখলেন বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করার তোড়জোড় চলছে।

ব্রজকিশোরবাবুর ভেজা জামাকাপড় দেখে নগেনবাবু তার এক ভাইপোকে দায়িত্ব দিলেন ধুতি পাঞ্জাবি জোগাড় করে দিতে। একজন সতেরো আঠারো বছরের ছেলে তড়িঘড়ি তাকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে চললো। ছেলেটি খুব সপ্রতিভ, তাকে ব্রজকিশোরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, -- কি নাম তোমার? ছেলেটি উত্তর দিল - অপূর্ব। আমি আপনাকে চিনি, অনেকদিন আগে আপনি একবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। হেসে ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিলেন ব্রজকিশোরবাবু। পোশাক পাল্টে বিয়ের আসরে ফিরতেই নগেনবাবু জোরাজুরি করতে লাগলেন খেয়ে নেওয়ার জন্য। অগত্যা অপূর্বর সঙ্গে যেতে হল খাওয়ার জায়গায়, পেছন পেছন নগেনবাবুও এলেন তদারকি করার জন্য।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে যেখানে বিয়ে হচ্ছে সেখানে আবার ফিরে এলেন ব্রজকিশোরবাবু। নগেনবাবু বিয়ের পর্ব শুরু করার জন্য পুরোহিতের সঙ্গে আসনে বসেছেন। একটা চেয়ার নিয়ে ব্রজকিশোরবাবু তার পাশে বসলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে নগেনবাবু মুচকি হাসলেন, বললেন - দাদা আপনি থাকুন আমার পাশে, ভরসা পাবো তাহলে। কিছুক্ষন পর বর -কনের ডাক পড়লো। ছেলেটি সরকারি চাকুরে, ভালো জামাই পেয়েছেন নগেনবাবু। কনেকেও খুব সুন্দর লাগছে, দুটিতে মানিয়েছেও ভালো। ভারী খুশী হলেন তিনি।

বিয়ের কাজ চলাকালীন নগেনবাবুর সাথে অল্প অল্প কথা হচ্ছিল,একসময় নগেনবাবু তাকে শুয়ে পড়ার অনুরোধ করলেন। ট্রেন জার্নি ও তারপর অনেকটা হেঁটে আসার জন্য শরীরের ক্লান্তি বোধহয় মুখে ফুটে উঠেছিল, তাই দেখেই হয়তো তিনি অনুরোধটা করলেন। শরীরটা সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। আবার সেই অপূর্বর ওপর দায়িত্ব পড়লো তার শোয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য।

নগেনবাবুদের যৌথ পরিবার, দোতলা বাড়ি তাই অনেকগুলো ঘর রয়েছে। দোতলার একটা নিরিবিলি ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হলো। অপূর্ব দরজা খুলে লাইট জ্বালাতেই দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোর ওপর নজর পড়লো। খুব চেনা লাগলো তার। পরক্ষনেই মনে পড়লো - এ তো সেই ছেলেটি যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। তিনি কৌতূহলী হয়ে অপূর্বর কাছে জানতে চাইলেন - এটা কার ফটো ? মুহূর্তে অপূর্বর উজ্বল মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে উত্তর দিলো - ওটা আমার দাদার ছবি। দাদা গত বছর মারা গেছে। ডিফেন্সে চাকরি পেয়েছিলো , কাশ্মীরে একটা এনকাউন্টারে মারা গেছে।

চমকে উঠলেন ব্রজকিশোরবাবু। তার মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভয়ে শীতের রাতেও ঘামতে শুরু করলেন তিনি। অপূর্ব সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল - জেঠু, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? একরাশ বিস্ময়মাখানো ভয় ব্রজকিশোরবাবুকে চেপে ধরতে লাগলো। অবিকল সেই মুখ , সেই চোখ। ঘরটা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন ব্রজকিশোরবাবু। বুঝলেন অপূর্বর দাদার অতৃপ্ত আত্মা তাকে এই বাড়ির

পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। মৃত্যুর পরেও সে এই বাড়ির অতিথিকে বিপদে পড়তে দেয়নি। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। বাড়ির মঙ্গল অনুষ্ঠানের দিন ছেলেটির আত্মা সব কিছুর ওপর নজর রেখেছে। তার মানে তার আত্মা এই মুহূর্তে হয়তো এখানেও উপস্থিত আছে। দোতলার নিরিবিলি জায়গাটা ছেড়ে ব্রজকিশোরবাবু আবার বিয়ের আসরে ফিরতে চাইলেন। দ্রুত নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। অপূর্ব ব্রজকিশোরবাবুর আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখে পেছন পেছন আসতে লাগলো, কি সব যেন বলছে ও। অথচ কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। কয়েক মুহূর্তেই চারপাশটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যেতে লাগলো। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে জ্ঞান হারালেন তিনি।

জীবন মৃত্যু

জীবনবাবুর বয়স এখন সত্তর। কলকাতার উপকণ্ঠে মফস্বলের এক প্রাচীন শহরে তার বসবাস। পৈতৃক বাড়ির যে অংশটি পেয়েছিলেন সেখানে টিকে আছেন একমাত্র তিনি। বাড়ির বাকি অংশের অংশীদার প্রায় ত্রিশজন, তাদের মধ্যে মতের অমিলের কারণে পুরোনো বাড়ির কোনো অংশই বিক্রি হয়নি। উপাধি ঘটক, জাতে ব্রাহ্মণ, সেটুকু সম্বল করে সারাজীবন যজমানি ও ঘটকালি করে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করেছেন। এখন সময় পাল্টেছে, তাই ঘটকালির প্রসার কমেছে। দু একজন কখনো সখনো ডাকে পাত্র পাত্রী খুঁজে দেওয়ার জন্যে। সকালে স্নান সেরে ফুল বেলপাতা জোগাড় করে নেন জীবনবাবু। তারপর দোকান বাজার খুললে ঘুরে ঘুরে দোকানের গণেশকে ফুল বেলপাতা ছড়িয়ে যেটুকু আয় হয় তাতেই তার পেট চলে। তিনি বিপত্নীক - স্ত্রী দশ বছর আগে গত হয়েছেন, তাই রান্না বান্না নিজেই করে নেন। কখনো সখনো শরীর খারাপ হলে রান্না করতে পারেন না, দোকান থেকে সামান্য কিছু কিনে নেন। বয়সের কারণে আর পাঁচ জনের মত রাতে ভালো ঘুম হয়না। লোডশেডিং হলে ছোট্ট গুমোট ঘরটার মধ্যে থাকা যায়না, তখন বারান্দাটায় বসে হাতপাখা টানতে টানতে বাকি রাত কেটে যায়।

আজও এমনই এক রাত, কিন্তু একেবারে অন্যরকম - ভয়ানক চমকে দেওয়ার মতো। অবাক হয়ে দেখলেন তার মৃত আত্মীয়স্বজনরা তাকে চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভারী অবাক হলেন তিনি। মা বাবা অনেকদিন হল গত হয়েছেন, তারাও সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ভারী খুশি হলেন। পরক্ষনেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। এতজন মৃত আত্মা তাকে এইভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন! তবে কি তিনি আর বেঁচে নেই ! হাত পা নাড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। চিৎকার করার চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। বুঝলেন শরীর তার আর বশে নেই, কিন্তু মাথা কাজ করছে। মনে করার চেষ্টা করলেন গত রাতের কথা। তার মনে পড়লো - গ্যাসের জন্যে বুকে সামান্য ব্যাথা হয়েছিল। ওই রকম তার মাঝে মাঝেই হয়। তবে কি সেটা গ্যাসের ব্যাথা ছিলো না, হার্ট ফেল করে হৃদরোগে কি তিনি মারা গেছেন! গল্প সিনেমায় দেখেছেন মৃত্যুর পর নাকি যমদূতরা হাজির হয়। তাই তিনি চারপাশে যমদূতদের খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু তেমন কাউকে দেখতে পেলেন না। খানিক নিশ্চিন্ত হলেন জীবনবাবু। পরক্ষনেই ভয় পেয়ে ভাবতে লাগলেন বেটারা নিরিবিলি দেখে কোন এক সময়ে হাজির হবে হয়ত। ভারী দোলাচলে পড়ে গেলেন জীবনবাবু। মনে মনে চাইলেন আশেপাশে ঘিরে থাকা আত্মাগুলো

যেন তাকে সারাক্ষন ঘিরে থাকে। কিন্তু ওরা তো কেউ মানুষ নয় , ওরা তো অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভুতুড়ে পরিবেশে ভুতের ভয়ে ভয়ঙ্কর ভয় পেলেন তিনি। তার এখন জীবন সংশয়, তিনি জীবিত আছেন কিনা জানার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে জীবন-মরণ পণ করলেন জীবনবাবু।

ক্যামেরা

রামরতনবাবুর ভুতে প্রেতে বিশ্বাস নাই। তিনি নাস্তিক নন, তবে দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিও নেই। আজীবন তার একটা স্বপ্ন - তিনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করবেন ও ভালো ক্যামেরায় প্রচুর ছবি তুলবেন। সরকারি চাকুরী হইতে অবসরের পর হাতে যৎসামান্য টাকা পয়সা আসিয়াছিল, তাই পুঁজি করিয়া ধর্মতলার একটি ক্যামেরা সারাইয়ের দোকান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড জাপানি ক্যামেরা কিনিলেন।

রামরতনবাবু নিঃসন্তান তাই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের বিশেষ দায় নাই। গিন্নির ইচ্ছায় কাশী বেড়াইতে গেলেন, সদ্য কেনা ক্যামেরায় বিস্তর ছবিও তুলিলেন। গোল বাঁধলো ছবিগুলি প্রিন্ট করিবার পর, দেখিলেন প্রতিটি ছবির মধ্যে একটা ভৌতিক অবয়বের আবির্ভাব হইয়াছে। ল্যাবরেটরির সমস্যা ভাবিয়া অন্য শহরের দোকান থেকে প্রিন্ট করিয়াও ফলাফল একই হইলো। সমস্যার সমাধান করিতে অতঃপর ক্যামেরাখানি মেরামত করিতে দিলেন। কিঞ্চিৎ অর্থ খরচ হইলো, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইলো না। রামরতনবাবু এখন ভুতে বিশ্বাস করেন এবং দেবদ্বিজেও বিশ্বাস করেন।

প্রবন্ধ

ক্ষুদ্র প্রয়াসে স্বনির্ভর মাছ চাষ

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

আমাদের রাজ্যে বহু চাষী নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকা মৎসজীবীগণ এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের বাড়ীর সংলগ্ন ছোট বা মাঝারি মাপের একাধিক জলাশয় থাকলেও দুঃখজনকভাবে অনেকেই সেগুলিকে ঠিক সম্পদ বলে মনে করেন না। পুকুরগুলির জলধারণের সামঞ্জস্য বিষয়ে কিছুটা অবগত হয়ে তাদের পরিপূর্ন সদ্ব্যবহার করতে পারলে স্বল্প বিনিয়োগে মাছের ফলন সম্ভব ও সেই সাথে সালোকসংশ্লেষের হেতু আপনা-আপনি জন্মানো প্রাকৃতিক খাদ্যকণা গঠিত হয় - ফলে জলজ পরিবেশ সুন্দর থাকে। মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার যে বিপুল সুযোগ রয়েছে - কেবলমাত্র কম সচেতনতার কারণে তার সঠিক রূপায়ণ হতে পারছে না। মাছ-চাষ মানেই যে সকলকে বড় মাছ চাষ করতে হবে - তা কিন্তু নয়। ছোট/মাঝারি মাছের চাষ করে একটি পুকুর থেকেও একবছরের মধ্যেই একাধিক মাছ উৎপাদন করা যেতে পারে - এতে উৎপাদনশীলতা বরং বেশিই হয়, চাষীর ঝুঁকি কমে, বিনিয়োগের অর্থ তাড়াতাড়ি ফিরে পাওয়া যায় লাভ সমেত এবং সর্বোপরি প্রান্তিক চাষীও কিছুটা নিরাপত্তা পেতে পারেন এই মাছ চাষ থেকে। শুধু জানতে হবে আয়ের জন্য কোন সম্পদটি বাছবো, কেমন হবে কলা-কৌশল, উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কিভাবে ইত্যাদি। আমাদের প্রত্যেক ব্লকে এখন মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক রয়েছেন - তাঁদের পরামর্শ কার্যকরী হবেই। রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য, পর্যাপ্ত মিষ্টি জলের সমাহার, অতি উর্বর মাটি, প্রকৃতির দান - অকৃপণ সূর্যকিরণ, অনুকূল তাপমাত্রা, চমৎকার বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি ও উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মাছ পরিপালনের পরম্পরাগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ-বান্ধব মাছের ফলনের মাধ্যমে আয়ের উৎসকে খুঁজে পাওয়া ফলে গ্রামীণ বিকাশ দুই-ই সম্ভব। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরের ব্যবস্থা প্রায়শই হয়ে থাকে পঞ্চায়েত দপ্তর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র , রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মৎস্য সংস্থাগুলিতে। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত NFDB র আর্থিক সহযোগিতাও অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ও এমনকি মাছচাষের উপকরণ দিয়েও সহায়তার কথা আমরা জেনে থাকি। কয়েকটি চাষের উল্লেখ মাত্র করা হলো এখানে - যেমন একটি ছোট পুকুরে বাটা মাছ বা সঙ্গে অল্প রুই/কাতলার আঙুলে পোনা ছাড়া যেতে পারে ও সেই সঙ্গে একই পুকুরের মধ্যে বাঁশের তৈরি খাঁচা বসিয়ে তার মধ্যে ট্যাংরা কিংবা সিঙ্গি/মাগুর মজুত করা যেতেই পারে। এদের খাবার হিসেবে বাইরে থেকে যোগান দেওয়া যেতে পারে টিউবিফেক্স কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম্ অথবা পরিমানে রোজ একবার করে অন্ততঃ , এছাড়া পুকুরের বাটা, রুই ইত্যাদির জন্য গরম জলে ভেজানো বাদাম।তিল খোল ও সঙ্গে চালের পালিশ গুঁড়ো কিংবা মুড়ি/চিঁড়ের গুঁড়ো/ স্থানীয় বেকারি থেকে পাওয়া বিস্কুট/কেক/রুটির গুঁড়ো মিশিয়ে চাউমিন বা মোটা সুতোর আকারে কিংবা ছোট বল তৈরি করে দিতে পারলে (সেও দিনে একবার মাত্র) মাছ সব ভালোই বেড়ে উঠবে। কাকদ্বীপে অবস্থিত CIBA গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে দুই কাঠার একটি পুকুরে চাষ করে প্রায় ৪০ কেজি তেলাপিয়া ও সেইসঙ্গে ৬ কেজি ট্যাংরা উৎপাদন করা গিয়েছে মাত্র ৬ মাসের একটি প্রকল্পে। অর্থাৎ দুই-কাঠার একটি পুকুর থাকলে সেখান থেকে দ্বি-স্তরীয় চাষের মাধ্যমে ছ- মাসেই ১৫,০০০/- টাকা আয় নিশ্চিত করা সম্ভব।

ছোট পুকুরে জল কম থাকলে ও - গভীরতা ৩-৪ ফুটও যদি থাকে টানা ৬ মাস তাহলে সেখানে শিঙ্গি/ মাগুর মাছ চাষ করা সম্ভব। ৫০গ্রাম ওজনের এইসব মাছ ও ৫০০-৬০০/- কিলো সহজেই বিক্রি হতে পারে যে কোনো জায়গায়। আগে এদের মজুত-যোগ্য ছোট পোনা পাওয়া সহজ ছিলোনা - কিন্তু এখন

অন্ততঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত দুটি KVK - একটি সোনারপুরে ও অপরটি জয়নগর নিমপীঠে পর্যাপ্ত পরিমানে পোনা পাওয়া যেতে পারে ও সেই সাথে চাষ-পদ্ধতির সহজ বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাওয়া যায়। নিয়মিত অল্প করে খাবার যোগান (ভাসমান খাবার - সাধারণত অনুপযুক্ত এক্ষেত্রে) দিতে হবে ও সেইসাথে পুকুরের মধ্যে ফেলে রাখা মাঝারি (২-২ ১/২ ফুট মতো লম্বায়) PVC পাইপ (৪'' ব্যাস যুক্ত) মাছের বিশ্রামাগারের কাজ করে। অনেকেই এই চাষ করতে গিয়ে পুকুরের মধ্যে মুরগির নাড়িভুঁড়ি, বিষ্ঠা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করেন, ফলে জল দূষণ এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে আর তখনই শুরু হয় রোগের প্রাদুর্ভাব ও মাছের মড়ক । জলের গুণমান ঠিক রাখতে পারলে (দ্রবীভূত সংমিশ্রণ কম থাকলেও চলবে) চাষে সমস্যা অনেকটা এড়ানো সম্ভব। এইরকম একটি প্রকল্প থেকে শিঙ্গি/ মাগুর চাষ করে একজন চাষী গড়ে ৮ - ১০,০০০/- টাকা মাসে আয় করতে পারেন।

বাটা মাছ চাষ একটি লাভজনক চাষ। আমাদের রাজ্যে এর চাহিদা বেশ ভালো। এর পোনা পাওয়া যায় খুব সহজেই। রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনাতে অবস্থিত CIFA ফার্মে সাধারণ বাটা (*Labeo bata*) ছাড়াও রাইখোল বা রেবা বাটা (*Cirrhinus reba*) র চাষ হয় ও পোনা পাওয়া যায় যদি সময় থাকতে কেউ যোগাযোগ করেন ওঁরা প্রশিক্ষণ ও দিয়ে থাকেন এই চাষ পদ্ধতির - বিশেষ করে চাষ প্রক্রিয়া, অসুখ বিসুখের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে। হাতের কাছে পাওয়া এমন সব উপকরণ যেমন তৈলবীজের খোল, ভুট্টার গুঁড়ো, ডালের গুঁড়ো/খোসা, চালের কুঁড়ো/খুদ এমনকি কাছেই অবস্থিত কল্যাণী ব্রুয়ারিস ফ্যাক্টরির DDGS (Dried distillers grain soluble) -এর সমন্বয়ে খাবার বানিয়ে ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত যোগান দিতে পারলে - মাছের বাড়বৃদ্ধি ভালো হবেই । দুটি আরো মাছ আছে - একটি মনিপুরের রাজ্য মাছ (পংবা ও অপরটি পায়রাচাঁদা বা কারিমীন (কেরালার রাজ্য মাছ) - এ দুটিও আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পুকুরে সফলতার সাথে চাষ হয়েছে। অন্য পোনার সাথেও এদের বিবাদ নেই। আকারে বড় হয়না - চার থেকে ছয় মাসে ৫০ গ্রাম থেকে ২০০গ্রাম ওজন অনায়াসে পাওয়া যায় এবং বাজারে চাহিদা ভালো। যে কটি মাছের উল্লেখ করা হলো - বাটা, পংবা, শিঙ্গি, মাগুর, ট্যাংরা, কারিমীন ছাড়াও আরও মাছ আছে - বিশেষতঃ পাঁকাল, খরশুলা ইত্যাদি - সেগুলির চাষের সম্ভাবনাও খুব আশাপ্রদ ও খরচসাপেক্ষ নয় এবং কেনা খাবার না দিলেও চলে যায় অনায়াসে। পুকুরে যদি অয়্যাজলা নিয়মিত দেওয়া সম্ভব হয় বা একটি ছোট ঘেরাটোপের মধ্যে অয়্যাজলা চাষ চলতে থাকে তাহলে এইসব মাছ চাষ করেও আয় সুনিশ্চিত হতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস কারণ আমরা বিপুলভাবে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠূ ব্যবহার ও আমাদের তারুণ্য শক্তি মেলবন্ধন করতে পারলে এক অভাবনীয় অভ্যুদয় সম্ভব আমাদের রাজ্যে; সারা দেশে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো আমরা -এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

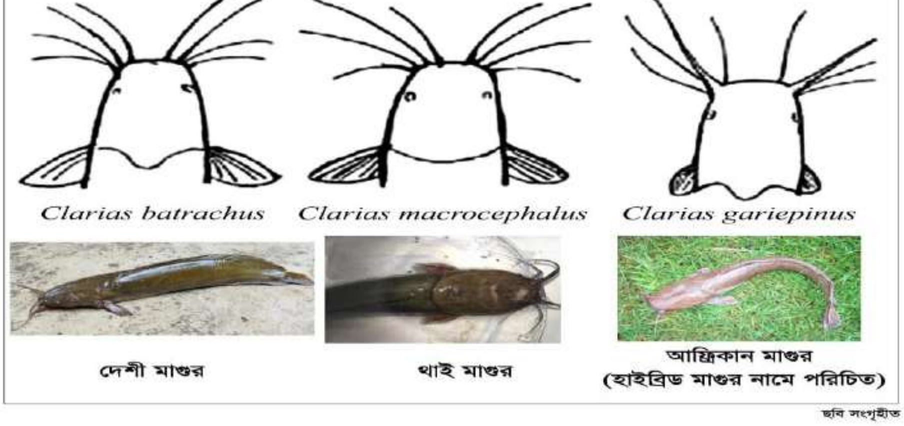

তিন প্রজাতির মাগুর মাছ চেনার উপায়

মাছ চাষের খাঁচা

এজোলা

কেঁচো সার

খনার জনপ্রিয় বচন

মৃন্ময় দত্ত

খনা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী যিনি ভবিষ্যৎ বক্তা রূপে পারদর্শীনী ছিলেন। তাঁর ভবিষ্যতবাণীগুলোই খনার বচন নামে বহুল পরিচিত এবং সমাদৃত। আনুমানিক ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। কিংবদন্তি আছে, তিনি বাস করতেন পশ্চিমবঙ্গের অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের দেউলিয়া গ্রামে। একদিন পিতা বরাহ এবং পুত্র মিহির আকাশের তারা গণনায় সমস্যায় পড়লে, খনা এ সমস্যার সমাধান করে রাজা বিক্রমাদিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গণনা করে খনার দেওয়া পূর্বাভাসে রাজ্যের কৃষকরা উপকৃত হতো বলে রাজা বিক্রমাদিত্য খনাকে দশম রত্ন হিসেবে আখ্যা দেন। খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। অসংখ্য খনার বচন যুগ যুগ ধরে গ্রাম-বাংলার জনজীবনের সাথে মিশে আছে।

তাঁর বচনগুলি ৪ ভাগে বিভক্ত:

* কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার, * কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, * আবহাওয়া জ্ঞান

* শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ।

কৃষি বিষয়ক সর্বাধিক জনপ্রিয় খনার বচন নিম্নে সংগ্রথিত হল:

১) চিনিস বা না চিনিস
খুঁজে দেখে গরু কিনিস।

২) যদি বর্ষে পৌষে,
কড়ি হয় তুষে।

৩) গরু ছাগলের মুখে বিষ।
চারা না খায় রাখিস দিশ।।

৪) চৈত্রে দিয়া মাটি
বৈশাখে কর পরিপাটি।

৫) জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা
শস্যের ভার সহে না ধরা।

৬) ভাদ্রের চারি, আশ্বিনের চারি
কলাই করি যত পারি।

৭) আউশ ধানের চাষ
লাগে তিন মাস।

৮) দিনের মেঘে ধান,
রাতের মেঘে পান।

৯) যে চাষা খায় পেট ভরে
গরুর পানে চায় না ফিরে
গরু না পায় ঘাস পানি
ফলন নাই তার হয়রানি।

১০) সকল গাছ কাটিকুটি
কাঁঠাল গাছে দেই মাটি।

১১) বার বছরে ফলে তাল,
যদি না লাগে গরু নাল।

১২) আষাঢ় মাসে বান্ধে আইল
তবে খায় বহু শাইল।

,

১৩) সুপারীতে গোবর, বাশে মাটি
অফলা নারিকেল শিকর কাটি।

১৪) তাল বাড়ে ঝোঁপে
খেজুর বাড়ে কোপে।

১৫) চাষী আর চষা মাটি
এ দু’য়ে হয় দেশ খাঁটি।

১৬) গাই পালে মেয়ে
দুধ পড়ে বেয়ে।

১৭) খনা বলে শুনে যাও
নারিকেল মুলে চিটা দাও
গাছ্ হয় তাজা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরে গোটা।

১৮) আখ আদা রুই
এই তিন চৈতে রুই

১৯) পটল বুনলে ফাগুনে
ফলন বাড়ে দ্বিগুণে।

২০) খনা বলে চাষার পো
শরতের শেষে সরিষা রো।

২১) ঘরের কোনে মরিচ গাছ
লাল মরিচ ধরে,
তোমার কথা মনে হলে
চোখের পানি পড়ে!

২২) খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।

২৩) হাত বিশ করি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।

২৪) সমানে সমানে দোস্তি
সমানে সমানে কুস্তি।

২৫) উঠান ভরা লাউ শসা
ঘরে তার লক্ষীর দশা।

২৬) যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্যি রাজা পুণ্যি দেশ।

২৭) হইবো পুতে ডাকবো বাপ
তয় পুরবো মনর থাপ।

২৮) সবল গরু, গভীর চাষ
তাতে পুরে চাষার আশ।

২৯) কাঁচা রোপা শুকায়
ভুঁইয়ে ধান ভুঁইয়ে লুটায়।

৩০) যদি বর্ষে ফাল্গুনে
চিনা কাউন দ্বিগুনে।

৩১) দিনে রোদ রাতে জল
দিন দিন বাড়ে ধানের বল।

৩২) ঘন সরিষা বিরল তিল।
ডেঙ্গে ডেঙ্গে কাপাস।।
এমন করে বুনবি শন।
না লাগে বাতাস।।

৩৩)) সেচ দিয়ে করে চাষ,
তার সবজি বার মাস।

৩৪) ক্ষেত আর পুত।
যত্ন বিনে যমদূত।।

৩৫) কাল ধানের ধলা পিঠা,
মা’র চেয়ে মাসি মিঠা।

৩৬) বেঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি জান।

৩৭) যদি বর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্যি রাজার পুণ্য দেশ।।
যদি বর্ষে ফাগুনে,
রাজা যায় মাগুনে।।

৩৮) শোনরে বাপু চাষার পো
সুপারী বাগে মান্দার রো৷৷
মান্দার পাতা পচলে গোড়ায়
ফড়ফড়াইয়া ফল বাড়ায়।

৩৯) গাছে গাছে আগুন জ্বলে
বৃষ্টি হবে খনায় বলে।

৪০) যদি হয় চৈতে বৃষ্টি
তবে হবে ধানের সৃষ্টি।

৪১) নিত্যি নিত্যি ফল খাও,
বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।

৪২) শুধু পেটে কুল
ভর পেটে মূল।

৪৩) সাত হাতে, তিন বিঘাতে
কলা লাগাবে মায়ে পুতে।
কলা লাগিয়ে না কাটবে পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

৪৪) যদি ঝরে কাত্তি।
সোনা রাত্তি রাত্তি।।

৪৫) শোন শোন চাষি ভাই
সার না দিলে ফসল নাই।

৪৬) গাছগাছালি ঘন রোবে না
গাছ হবে তার ফল হবে না।

৪৭) চালায় চালায় কুমুড় পাতা
লক্ষ্মী বলেন আছি তথা।

৪৮) বারো মাসে বারো ফল
না খেলে যায় রসাতল।

৪৯) তিন নাড়ায় সুপারী সোনা,
তিন নাড়ায় নারকেল টেনা,
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল,
তিন নাড়ায় গেরস্থ গল।

৫০) সোল বোয়ালের পোনা,
যার যারটা তার তার কাছে সোনা।

৫১) গাঁ গড়ানে ঘন পা।
যেমন মা তেমন ছা।।
থেকে বলদ না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।।

৫২) পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
য'দ্দিন কুয়া ত'দ্দিন জল।
শনিতে সাত মঙ্গলে/(বুধ) তিন।
আর সব দিন দিন।

৫৩) জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা।

৫৪) এক পুরুষে রোপে তাল,
অন্য পুরুষি করে পাল।

৫৫) হলে ফুল কাট শনা।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণা।।
তারপর যে সে খাবে,
তিন পুরুষে ফল পাবে।

৫৬) তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাকগা চাষি মাচায় শুয়ে

৫৭) আম খেয়ে খায় পানি,
পেঁদি বলে আমি ন জানি।

৫৮) চৈত্রেতে থর থর
বৈশাখেতে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠতে তারা ফুটে
তবে জানবে বর্ষা বটে।

৫৯) যদি অশ্বি কুয়া ধরে,
তবে ধানগাছে পোকা ধরে।

৬০) গরুর পিঠে তুললে হাত।
গিরস্থে কভু পায় না ভাত।।
গাই দিয়া বায় হাল
দু:খ তার চিরকাল।

৬১) সরিষা বনে কলাই মুগ,
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।

৬২) দিন থাকতে বাঁধে আল।
তবে খায় তিন শাল।।
বারো পুত তেরো নাতি।
তবে করো বোরো খেতি।।

৬৩) আউশের ভুই বেলে,
পাটের ভুঁই আটালে।

৬৪) পূর্ণিমা আমাবস্যায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ হয় চিরকাল।
যার বলদের হয় বাত,
তার ঘরে না থাকে ভাত।
খনা বলে আমার বাণী,
যে চষি তার হবে জানি।

৬৫) ভাদ্র আশ্বিনে বহে ঈশান,
কাঁধে কোদালে নাচে কৃষাণ।

৬৬) ফাল্গুন না রুলে ওল,
শেষে হয় গণ্ডগোল।

৬৭) বাড়ীর কাছে ধান পা,
যার মার আগে ছা।
চিনিস বা না চিনিস
ঘুঁজি দেখে কিনিস।

৬৮) পান লাগালে শ্রাবণে,
খেয়ে না কুলায় রাবণে।

৬৯) শীষ দেখে বিশ দিন,
কাটতে কাটতে দশদিন।
ওরে বেটা চাষার পো,
ক্ষেতে ক্ষেতে শালী রো।

৭০) ভাদরের চারি আশ্বিনের চারি,
কলাই রোব যত পারি।

৭১) আষাঢ়ের পানি।
তলে দিয়া গেলে সার।
উপরে দিয়া গেলে ক্ষার।।

৭২) যে চাষা খায় পেট ভরে।
গরুর পানে চায় না ফিরে।
গরু না পায় ঘাস পানি।
ফলন নাই তার হয়রানি।।

৭৩) খনা বলে শুন কৃষকগণ
হাল লয়ে মাঠে বেরুবে যখন
শুভ দেখে করবে যাত্রা
না শুনে কানে অশুভ বার্তা।
ক্ষেতে গিয়ে কর দিক নিরূপণ,
পূর্ব দিক হতে হাল চালন
নাহিক সংশয় হবে ফলন।

৭৪) আকাশে কোদালীর বাউ।
ওগো শ্বশুড় মাঠে যাও।।
মাঠে গিয়া বাঁধো আলি।
বৃষ্টি হবে আজি কালি।।

৭৫) গোবর দিয়া কর যতন,
ফলবে দ্বিগুণ ফসল রতন।

৭৬) বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়,
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়।

৭৭) যদি থাকে টাকা করবার গোঁ।
চৈত্র মাসে ভুট্টা দিয়ে রো।।

৭৮) যদি বর্ষে কাতি,
রাজা বাঁধে হাতি।

৭৯) আম লাগাই জাম লাগাই
কাঁঠাল সারি সারি-
বারো মাসের বারো ফল
নাচে জড়াজড়ি।

৮০) মেঘ করে রাত্রে হয় জল।
তবে মাঠে যাওয়াই বিফল।।

৮১) ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।

৮২) ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী,
শোন পতির পিতা,
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে
রাজ্য নাশে, গো নাশে,
হয় অগাধ বান,
হাতে কাটা গৃহী ফেরে
কিনতে না পান ধান।

৮৩) শুনরে বেটা চাষার পো,
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রো।
আষাঢ় শাওনে নিড়িয়ে মাটি,
ভাদরে নিড়িয়ে করবে খাঁটি।
হলুদ রোলে অপর কালে,
সব চেষ্টা যায় বিফলে।

৮৪) বৈশাখের প্রথম জলে,
আশুধান দ্বিগুণ ফলে।

৮৫) কি করো শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।
কোদাল কুড়লে মেঘের গাঁ,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলোগে বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।

৮৬) চৈতের কুয়া আমের ক্ষয়
তাল তেঁতুলের কিবা হয়।

৮৭) বিশ হাত করি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
গাছ গাছি ঘন রোবে না,
ফল তাতে ফলবে না।

৮৮) শুনরে বাপু চাষার বেটা
মাটির মধ্যে বেলে যেটা
তাতে যদি বুনিস পটল
তাতে তোর আশার সফল।

৮৯) লাঙ্গলে না খুঁড়লে মাটি,
মই না দিলে পরিপাটি
ফসল হয় না কান্নাকাটি।

৯০) ফাগুনে আগুন,চৈতে মাট
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।

৯১) হালে নড়বড়, দুধে পানি
লক্ষ্মী বলে চললাম আমি।

৯২) গো নারিকেল নেড়ে রো
আমা টুকরা কাঁঠাল ভো।

৯৩) যদি না হয় আগনে বৃষ্টি
তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।

৯৪) যদি না হয় আগনে পানি,
কাঁঠাল হয় টানাটানি।

৯৫) খনা বলে শোনভাই
তুলায় তুলা অধিক পাই।

৯৬) সবলা গরু সুজন পুত
রাখতে পারে খেতের জুত।

৯৭) খনা বলে শুনে যাও
নারিকেল মুলে চিটা দাও
গাছ হয় তাজা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরে গোটা

৯৮) ঘন সরিষা পাতলা রাই
নেংগে নেংগে কার্পাস পাই।

৯৯) আগে বাঁধবে আইল
তবে রুবে শাইল।

১০০) তিন শাওনে পান
এক আশ্বিনে ধান।

১০১) থাক দুখ পিতে,(পিত্তে)
ঢালমু দুখ মাঘ মাসের শীতে।

১০২) গরু-জরু-ক্ষেত-পুতা
চাষীর বেটার মূল সুতা।

১০৩) চাষে মুলা তার
অর্ধেক তুলা তার
অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।

১০৪) পাঁচ রবি মাসে পায়,
ঝরা কিংবা খরায় যায়।

১০৫) বেঙ ডাকে ঘন ঘন,
শীঘ্র হবে বৃষ্টি জান।

১০৬) চালায় চালায় কুমুড় পাতা,
লক্ষ্মী বলেন আছি তথা।

১০৭) আখ, আদা, পুঁই,
এই তিনে চৈতি রুই।

১০৮) চৈত্রে দিয়া মাটি,
বৈশাখে কর পরিপাটি।

১০৯) চৈতের ধূলি, বৈশাখের পেঁকি
ধান হয় ঢেঁকি ঢেঁকি।

১১০) দাতার নারিকেল,বখিলের বাঁশ,
কমে না বাড়ে বারো মাস।

১১১) সোমে ও বুধে না দিও হাত,
ধার করিয়া খাইও ভাত।

১১২) ধানের গাছে শামুক পা,
বন বিড়ালী করে রা।
গাছে গাছে আগুন জ্বলে,
বৃষ্টি হবে খনায় বলে।

১১৩) কচু বনে ছড়ালে ছাই,
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।

১১৪) পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা,
পূর্বের ধনু বর্ষে ঝরা।
স্বর্গে দেখি কোদাল কোদাল
মধ্যে মধ্যে আইল
ভাত খাইলাও শ্বশুর মশায়
বৃষ্টি হইবে কাইল।

১১৫) তিথি বারো,
স্বনক্ষত্র মাসের বারোদিন
একত্র করিয়া তারে
সাতে করো হীন,
একে শুভ, দুইয়ে লাভ,
তিনে শত্রুক্ষয়
চতুর্থেতে কার্যসিদ্ধি,
পঞ্চমে সহায়,
ষষ্ঠে মৃত্যু, শূন্য হলে
পায় বহু দুঃখ,
খনা বলে যাত্রা কভু নাহি সুখ।

১১৬) চৈতের ধূলি, বৈশাখের পেঁকি
ধান হয় ঢেঁকি ঢেঁকি।

১১৭) আগে বেঁধে দেবে আইল,
তবে তায় রুইবে শাইল।

১১৮) ঊণা মাতে দুনা বল
অতি ভাতে রসাতল।

১১৯) আউশের ভুঁই বেলে,
পাটের ভুঁই আঁটালে

১২০) যদি বর্ষে আগনে,
রাজা যায় মাগনে,
যদি বর্ষে পৌষে,
শস্য যায় তুষে।

১২১) মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যেইবার,
রবিশেষে মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার,
সোম, শুক্র গুরু যার,
পৃথ্বী সয়না শস্যের ভার।

১২২) আঁধারে পড়ে চাঁদের কলা
কতক কালা, কতক ধলা,
উত্তর উঁচু, দক্ষিণ কাত
ধারায় ধারায় ধানের হাত,
ধান-চাল দুই-ই সস্তা
মিষ্টি হবে লোকের কথা।

, ১২৩) যে গুটিকাপাত হয় সাগরের তীরেতে,
সর্বদা মঙ্গল হয়, কহে জ্যোতিষেতে।
নানা শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়,
খনা কহে মিহিরকে, নাহিক সংশয়।

বিবাহ বিভ্রাট

সুধাংশু শেখর পাল

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক আশ্চর্য প্রাণীর নাম কি ? আমি ইতঃস্তত চিন্তা না করে মনুষ্য বা মানুষের নাম নেবো। সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, মানুষের মতে উন্নত, বুদ্ধিমান, চতুর, সৃজনশীল আর সামাজিক প্রাণীর ব্যাপারে যত কিছু বলা যায় তাহাতে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। যে সমাজে আমরা বাস করছি সেটা মানুষের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত সুসংবদ্ধ সংরচনা। সমাজ সততঃ গতিশীল এবং আমাদের তৈরী সমাজব্যবস্থা সময়ের সাথে সাথে নব নব উদ্ভাবনা ও বিবর্তনের মধ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কালের অপ্রতিরোধ্য গতিতে জীবজগতে এসেছে বিবর্তন। পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পেরে বহু অতিকায় ও বলশালী জীবকুল পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। পরন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন ও জৈব বিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে মনুষ্য বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। কিনা করেছে মনুষ্যকুল ? জাগতিক সুখ লাভের বিবিধ উপকরণের উদ্ভাবন, মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য নিজেকে ধর্মীয় চিন্তা ও ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত করে মহান উপলব্ধি সাধন করেছে। মনুষ্যকুল নিজস্ব অত্যাশ্চর্য সৃজনশীলতার মাধ্যমে, শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধার্মিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেই চলেছে। এইভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মানবসভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তন।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজের প্রয়োজনে সমাজ সৃষ্টি করেছে। যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায় জীবনশৈলীকে সুপরিকল্পিত ও উন্নত করে সভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। এই অগ্রগতির পথে চলা মনুষ্য জাতির পক্ষে আদৌ সুখদায়ী হয়নি বা ভবিষ্যতে হবার সম্ভবনাও কম। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চলতে চলতে অসফলতার কারণ নির্ধারণ করে সফলতার চাবিকাঠি নিজেই খুঁজে নিয়েছে। সমাজ ও সমাজব্যবস্থা সতঃ পরিবর্তনশীল - আজ যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত, আগামীদিনে তার আমূল পরিবর্তন হওয়াটা আদৌ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। পরিবর্তনের প্রভাব সদর্থক কিংবা অতীতের অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনাময় হতে পারে।

প্রকৃতি ও সমাজে দুটি বিপরীতধর্মী সত্বা - একটি নারী অন্যটি পুরুষ, একে অপরের পরিপূরক। একটি সত্বার আর এক সত্বার উপর অপার আকর্ষণ আর আছে নুতন সৃষ্টির উন্মাদনা, সঙ্গে জীবনের নানা রহস্য উদ্ঘাটনের যৌথ প্রয়াস। একটি পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে উদ্ভূত মানব বন্ধনকে নৃতত্ববিদরা পরিবার আখ্যা দিয়েছেন আর এটাই সমাজের একটা সর্বনিম্ন একক(lowest unit)। সমাজে বাস করতে হলে শুধু নিজের স্বার্থ পূরণ নয়, অন্যের হিতাহিতের ব্যাপারে চিন্তা করা অপরিহার্য - যেটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ।

মনুষ্যসমাজে বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা কবে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক কাল নির্ধারণ সম্ভবপর নয়, তবে এটা নিশ্চিত যে স্থান কাল ভেদে সমাজব্যবস্থায় বেশ কিছু সদর্থক নিয়মনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক পরিণত বয়স্ক ও পরিণত মনস্ক নরনারীর পরিবার তথা সমাজে একত্র বাসের মাধ্যমে জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ, অর্থ উপার্জন, ধর্মীয় চিন্তন ও ধর্মাচরণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সন্তান উৎপাদনের পারিবারিক তথা সামাজিক মান্যতাকে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও মনুষ্য সমাজ স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এখানে এক পুরুষ ও নারী একে অপরের কেবলমাত্র শয্যাসঙ্গী নয়, একে অপরের পরিপূরক ও বন্ধু - হয়ত এর উপরে অনেক কিছু যা ভাষার মাধ্যমে পরিপূর্ন ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। সমাজে কে কাহাকে বিবাহ করিবে সেটা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ব্যাপার হওয়া সত্বেও তৃতীয় পক্ষের(পরিবার ও সমাজের) অনাকাঙ্খিত অনুপ্রবেশের পক্ষে ও বিপক্ষে তার্কিক আলোচনা ও সংঘর্ষ আবহমান কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম ও রীতিনীতির প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবিত। ভারতবর্ষের মত বিশাল ও বৈচিত্রময় ভূখণ্ডে বিবাহপ্রথা বৈদিক রীতিনীতি মেনে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আধারিত সামাজিক বিবাহ থেকে বর্তমানে প্রেম বিবাহ ও রেজিস্ট্রি

বিবাহ পর্যায়ে উপনীত হতে অনেক বিবর্তনের মধ্যে চলতে হয়েছে। এই চলার পর্বে বিবাহ ব্যবস্থায় অভিভাবকদের প্রাধান্য ধীরে ধীরে হ্রাস হতে হতে ব্যক্তিবিশেষের পছন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্তর্ধর্মীয়(inter religion) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ (inter cast) এমনকি বিভিন্ন দেশের পাত্র পাত্রীদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হওয়াটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। বৈদিক যুগে(১৫০০ - ৫০০ BCE) পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে পিতামাতা/ অভিভাবকদের পছন্দমতো জাতি, ধর্ম, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জোতিষমতে যোটক বিচার করে বিবাহ সম্পাদিত হতো - যা এখনও আধুনিক বিবাহ প্রথার সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে চলছে। এতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে কিন্তু আমরা একে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারিনি। এই প্রথাকে পারম্পরিক বা চিরাচরিত বিবাহ প্রথা বলা অনুচিত হবেনা। এ শুধু পাত্রপাত্রীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন নয়, দুটি ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াস। বৈদিক পরবর্তী গুপ্তযুগে (চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী C E) স্বয়ম্বর প্রথার মাধ্যমে কন্যা সতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের জীবনসাথী পছন্দ করে তাকে বরমাল্য প্রদান করে বিবাহ করতে পারত।

এই সময় থেকে বিবাহ বিষয়ক আইনকানুন প্রচলিত হয়। উল্লেখনিয় হিসাবে মনুসংহিতার নাম নেওয়া আবশ্যক - যেখানে স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে ও লিঙ্গবৈষম্য প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগীয় বিবাহ ব্যবস্থায় ভারতীয় ও বহিরাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতিনীতির সংমিশ্রনে নুতন বিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ(POLYGAMY) এবং হিন্দুদের মধ্যে একদার পরিগ্রহণ(MONOGAMY) সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। মুঘলযুগে মুসলমানদের মধ্যে "নিকাহ" এবং হিন্দুদের মধ্যে "সপ্তপদী" নামক ধর্মীয় বিবাহ প্রথার প্রবর্তন হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতে Marriage Act 1955 এবং Special Marriage Act 1954 চালু হওয়ার মাধ্যমে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি আইনি রক্ষাকবচ পায়। এর ফলে দুই ভিন্ন ধর্ম বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ আইনগত মর্যাদা পায় ও ব্যক্তিবিশেষ নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা অর্জন করে। পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে প্রেম বিবাহের মাধ্যমে পাত্র পাত্রী স্বেচ্ছায় জীবনসাথী নির্বাচন করে বিবাহ করার স্বীকৃতি অর্জন করে। ভারতীয় উপমহাদেশে আর্থিক দৃষ্টিতে সাবলম্বী ও পশ্চিমি শিক্ষার আলোতে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত প্রেম বিবাহে কোনো বাধাই রইলো না।

ভারতবর্ষে বিবাহ চিরাচরিত ও আধুনিক ধ্যানধারণার আলোকে আলোকিত হয়ে নুতন এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে। এটাকে একটা অভিনব রূপান্তর বলা যায়। পত্নী শুধু গৃহকার্য, মনোরঞ্জন ও সন্তান উৎপাদনের জন্য নয় , একে অপরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্ত দায়দায়িত্বের ভাগিদার হয়ে জীবন নির্বাহ করা, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। নারী অধিকার আন্দোলন ও নারী ক্ষমতায়ন এই বিষয়ে উল্লেখনীয় অবদান রেখেছে। উপরন্তু ভারতে বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৫৪ চালু হওয়ায় বিবাহে জীবনসাথী চয়ন করার ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিবিধতা আধুনিক বিবাহে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

অধুনা ভারতবর্ষে বিবাহ ব্যাপারে কিছু সংস্কারমূলক বিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখনীয় হিসাবে সমলিঙ্গিক ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পরিণতবয়স্ক নরনারী স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্র বাস(live -in relation) ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত কিন্তু ক্রমবর্ধমান ঘটনা হিসাবে সমাজে প্রকট হচ্ছে। এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী প্রমান করে সমাজের গতিশীলতা ও নমনীয়তা। হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৯৫ প্রণয়নের মাধ্যমে হিন্দু সমাজে বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলি যেমন বিবাহ নথিভুক্তকরণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে আইনি রক্ষাকবচ প্রদানের মাধ্যমে লিঙ্গসাম্যতা(gender equity) বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে(হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসী ইত্যাদি) বিবাহের জন্য পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রথার মান্যতা ও সমুচিত সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়। যদ্যপি উপরোক্ত সংস্কারমূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে লিঙ্গসাম্যতা ও ব্যক্তিগত পছন্দ প্রাধান্য পেয়েছে, তদোপরি বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে হিংসা, বিবাহপণ এবং অন্য প্রকার বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার মতো বর্বরোচিত ঘটনাবলী প্রমান করে বাস্তবিকতা থেকে আমরা কতটা দূরে আছি। আর ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় কি? এইভাবে সমলিঙ্গিক বিবাহ/ সম্পর্ক ও আইনের আতসকাঁচে এক সংবেদনশীল ব্যাপার।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানিক সামাজিক প্রথার বিষয়ে আমরা যতই আধুনিক মানসিকতা রাখিনা কেন এই মানসিকতা সমাজে কতদিন টিকবে বা ভবিষ্যতে আরো বিবর্তন আসতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে অনুমান করা খুবই কষ্টকর। বিবাহ সম্বন্ধীয় আচারবিধি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক, কানুনী এবং সামাজিক দায়রা ও পরিবর্তিত হতে থাকে। বিশেষ করে বিবাহের সামগ্রিক ভোল বদল (shifting dynamics of marriage) সত্যি একটা বিচার্য বিষয়। এই ভোলবদল মধ্যে আছে (LGBTQ+ অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি) প্রযুক্তির প্রভাব এবং ক্রমবর্ধমান দাম্পত্য কলহ।LGBTQ ইংরেজি শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে তৈরি যেখানে L এর অর্থ নারী সমকামী(Lesbanian), G(Gey) পুরুষ সমকামী, B (Bisexual); উভয়কামী, T(TRANSGENDER) রূপান্তরকামী এবং Q (QUER)হিঁজড়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শারীরিক/ মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বীকৃতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ১৯৮০ দশকের কাছাকাছি সময় থেকে চলে এলেও ভারতীয় ও অন্য দেশের সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে জর্জরিত।

উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহ যেমন সমাজ মাধ্যম, ডেটিং- এপস, দূরাভাস ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ স্থাপন একদিকে যেমন বিবাহ ব্যাপারে সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অন্যদিকে বৈবাহিক দ্বন্দ ও অবিশ্বাসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিবাহ বিষয়ক ব্যাপার গুলি বৈদ্যুতিন নজরদারির আওতায় আসায় বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের মধ্যে এক প্রাচীর তৈরির সম্ভবনা প্রকট হতে চলেছে। বিবাহ ব্যবস্থা কে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হলে বিচারব্যবস্থা ও সমাজকে আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সাম্য, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা এবং স্বতন্ত্রতা বিষয়ক সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

অধুনা একটা তর্ক প্রায়ই যুববর্গের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। সেটা হলো জীবনে বিবাহ কি জরুরি? বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলে আধুনিকমনস্ক যুববর্গের এক অংশ মনে করেন। তাদের কাছে জীবনের অন্য বৃহত্তর দিকগুলি যেমন উচ্চতর শিক্ষালাভ, শিক্ষা অনুযায়ী পেশাগত চাকুরী বা স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, সুস্বাস্থের অধিকারী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন - জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। এই সমস্ত দিক আলোচনা করলে মনে হয় যুবসম্প্রদায় এক প্রহেলির মধ্যে নিমজ্জিত হতে চলেছে কিনা ? To get married or not- that's the question. স্বনির্দিষ্ট উচ্চাকাঙ্খা পূরণ সময়সাপেক্ষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত। সে হিসেবে বিবাহের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব কি ? বিবাহের সময় যৌবন চলে গিয়ে যদি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছোয় তাহলে বিবাহের কি বা প্রয়োজন ? .

জীবনে আছে উত্থান পতন। সেভাবে দেখলে বিবাহ ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক বিভিন্ন ঘাত -প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারে। আর যদি কোনো কারণে সম্পর্কে বিচ্ছেদ আসে তাকে সামলে কিভাবে অভিষ্ঠলাভ করবে সে বিষয়ে ভাবার আছে। এ ও নিশ্চিত যে বিষম পরিস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য রাখা কষ্টকর এবং অবসাদেও ভুগতে পারেন। এ বিষয়ে অন্যের কাছ থেকে কোনোপ্রকার সাহায্য পাওয়া মুশকিল। প্রাপ্ত বিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অভিষ্ঠ অর্জনের জন্য (উপযুক্ত জীবনসাথী নির্বাচন) পুনরায় প্রচেষ্ট হবে কিংবা "আঙ্গুর ফল টক" বলে সমস্ত চেষ্টা থেকে বিরত হবে - এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত। তুমি তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। তোমাকেই ঠিক করতে হবে তুমি কি চাও। বিবাহে যেমন প্রাপ্তিযোগ (যশ , প্রতিপত্তি, অর্থ , সুখ-সমৃদ্ধি, মানসিক প্রশস্তি লাভ) ইত্যাদি আছে তেমনই আছে অনেক ঝুঁকি। তবে বেশি তর্কে না গিয়ে বিবাহ ব্যাপারে একটা S W O T ANALYSIS অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের পাকা সিলমোহর (??) লাগানোর আগে এর ভালোমন্দ দিকসমূহ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অসুবিধাগুলিও ভালোভাবে বিচার করা প্রয়োজন। দরকারে অভিভাবক বা পেশাগত বিবাহ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাবধান ! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আপনার। অন্যের উপর দোষারোপ উচিত হবে কি ?

বিবাহ ব্যাপারে আর একটা বিভ্রান্তিকর (বর্তমান সময় ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) একটা প্রশ্নের উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল বিবাহের উপযুক্ত বয়স। যদ্যপি ভারতের সংবিধানে তথা ভারতের

বিবাহ আইনে পুরুষ ও স্ত্রীবর্গের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা (পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর) নির্ধারিত করা হয়েছে তদ্যপি ভারতে বাল্যবিবাহ বিশেষত সমাজের নিম্ন বর্গ ও কম উপার্জনকারী পরিবারের মধ্যে একটা চিন্তার কারণ। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্গের মধ্যে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট বয়সসীমার পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক হতে চলেছে। একটা ছোট উদাহরণ সহকারে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চাই। আগের মতো মধ্যবিত্ত তথা উচ্চবিত্ত সমাজে প্রথম দর্শনে প্রেম বা বিবাহের সম্পর্ক পাকা করাটা প্রায় দূর-অস্ত হতে চলেছে। বোধহয় বিবাহ ব্যাপারটা ভোগবস্তুবাদ (CONSUMERISM) ও বিশ্বায়ন (GLOBALISATION) এর দিকে বেশি ঝুঁকতে চলেছে। যদি বিবাহ সামাজিক অর্থাৎ অভিভাবকদের তত্বাবধানে হয় তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর উভয়পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন আসে - বিবাহ কি এক্ষুনি করতে চান ? আমাদের কিন্তু তাড়া নেই। প্রতিপক্ষের উত্তর - কি মশাই নেটে/ পেপারে বিবাহের বিজ্ঞাপন দিলেন আর এখন বলছেন তাড়া নেই ? আসল ব্যাপারটা হয়ত অন্য কিছু এবং এটা অন্যভাবে নেওয়া উচিত হবে কিনা জানিনা। সবাই সবাইকে টেক্কা মেরে বড় কিছু পেতে চায় (BIG FISH CATCH) . সবার ভাগ্যে বড় কিছু পাওয়া কতটা সম্ভব তা বলা মুশকিল। তবুও এ খেলা খেলতে হয়। এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় আছে ? উত্তরটা আপনাদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

অলীক মরীচিকার পিছনে দৌড়ে ধীরে ধীরে হতাশায় ভোগার সম্ভাবনা এই মানসিকতার এক বিষম পরিনাম হতে চলেছে। অভিষ্ঠলাভের জন্য অপেক্ষা শ্রেয় আর এর জন্য যদি যৌবনের কাজটা প্রৌঢ়ত্বে করতে হয় তার লাভ লোকসানের হিসাব কি ভোগবাদ আর বিশ্বায়ন তত্বে পাওয়া যাবে ?

বিবাহের আর একটা দিক আলোচনা করতে চাই। একটু কাব্যিক শব্দবিন্যাসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম। আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার বা রাজকুমারী ভবিষ্যতে কিভাবে একে অপরের কাছে প্রকট হবেন বা জীবনের রঙ্গশালায় তাহারা কেমন রঙ্গ করবেন তার উপর বৈবাহিক সম্পর্কের নিবিড়তা, মধুরতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তা কাহারও অজানা নয়। বছরের পর বছর প্রাক বৈবাহিক মেলামেশা ও বন্ধুত্ব স্থাপনের পর বিবাহ এবং বিবাহ পরবর্তী সংঘাত ও পরিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমবর্ধমান হতে চলেছে। তাহলে উপায় কি? আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন ? সে কঠোর সাধনায় ব্রতী হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের কাছে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র আর সর্বোতভাবে প্রচেষ্টায় উপযুক্ত জীবনসাথী নির্বাচন আর বিবাহের দ্বারা জীবনকে পরিপূর্ন করার প্রচেষ্টা জনসমূহের এক বৃহত্তর অংশের কাছে এখন ও গ্রহণযোগ্য।ব্যতিক্রম তো সর্বদাই থাকবে বা থাকা উচিত। নতুবা আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা , রতন টাটা বা এ পি জে আব্দুল কালাম পেতাম কোথায় ?

জীবন অনিত্য। এই অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান করা "অমৃতস্য পুত্র" মানবজাতির মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবাহে ব্রতী হওয়া উচিত নয় কি ? এ বিষয়ে ও তর্ক সমীচীন। বিবাহ করা উচিত বা অনুচিত - এ সম্বন্ধে শুধু একটা কথা বলতে চাই, সিদ্ধান্ত পক্ষে বা বিপক্ষে যাহা হউক না কেন পরে যেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বলতে না হয় " জেনেশুনে আমি বিষ করিয়াছি পান " । জীবন প্রবাহের সমুদ্র মন্থনে অমৃত এবং গরল দুটি ই প্রাপ্তির সম্ভাবনা। শুধু অমৃত পান করলে চলবে কি? ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা বিষকে নিষ্কাশিত করা শ্রেয়। নীলকণ্ঠ হবার মত মানসিকতা বা সামর্থ্য ক' জনের বা আছে ?

জীবন এক প্রহেলিকা আর এই প্রহেলিকার জটিলতম এক অধ্যায় বিবাহ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথার নব নব বিবর্তন হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব নানা উদ্ভাবনার মাধ্যমে বিবাহের জন্য উপযুক্ত জীবনসাথী নির্বাচন হয়ত কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে উদ্ভুত রোবট বা যন্ত্রমানব বা মানবী আমাদের অনেক কষ্ট লাঘব করবে। এর আগমনী সংগীত হয়ত অনেকে শুনতে পাচ্ছেন। যন্ত্রে মানবিক গুণাবলীর সমন্বয়ের প্রচেষ্টা সফল হলেও জীবনসাথী হিসেবে যন্ত্র মানব বা যন্ত্রমানবীর গ্রহণযোগ্যতা ভবিষ্যৎ ই বলতে পারবে।

কুকুর পোষার বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতা

দিলীপ কুমার কুন্ডু

2004 সাল থেকে প্রতি বছর 26 শে আগস্ট "বিশ্ব সারমেয় দিবস" হিসাবে পালন করা হয়। বছরের এই বিশেষ দিনটি পালনের উদ্দেশ্য: চারপেয়ে, লোমশ বন্ধু প্রাণীটির মানুষের জীবনে সদর্থক ভূমিকার বিষয়ে সবাইকে অবগত করানো। এই দিন অনেকে তাদের পরিবারে কুকুরকে তাদের পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এবছরের বিশ্ব সারমেয় দিবসে তাই লিখতে বসলাম নীচের প্রতিবেদনটি।

আমাদের মধ্যে অনেক কুকুরপ্রেমীরা জানে কুকুরের সাথে কাটানো জীবন কতটা আনন্দময়। কিন্তু এটা কি নিতান্তই একটা অনুভূতি, না কি এর পেছনে কোন বিজ্ঞান আছে?

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে কুকুর পোষা আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পোষ্য কুকুর আমাদের আধুনিক জীবনের টেনশন ও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কুকুর পোষার কয়েকটি বিজ্ঞান সম্মত উপকারিতার ব্যাপারে এখানে আলোচনা করব।

একাকী মানুষের জীবনে পোষ্য কুকুর শর্তহীন ভালোবাসা ও আবেগী সহায়তা প্রদান করে। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন যে পোষ্য কুকুর মানুষের জীবনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্মতা অনেকাংশে লাঘব করতে পারে।হিউম্যান এনিম্যাল বন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর একটা গবেষণায় দেখা গেছে: পোষ্য কুকুরের সাথে সময় কাটিয়ে মানুষের জীবনের 85 শতাংশ একাকীত্ব দূর করা সম্ভব। আধুনিক ও ব্যস্ততাময় জগতে বয়স্ক নাগরিকদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কাটাতে পোষ্য কুকুর অনেক সাহায্য করে।

কুকুর পোষক মানুষেরা সাধারণত দীর্ঘায়ু হয়। 1950 থেকে 2019 সালের মধ্যে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কুকুর পোষক মানুষের রক্তচাপ ও মানসিক চাপের মাত্রা কম এবং নিয়ন্ত্রণে থাকে। গবেষকদের মতে কুকুরের সাথে হৃদ্যতা মানুষের মানসিক চাপ কমিয়ে cardiovascular সমস্যা নিরসনে সাহায্য করে।

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পোষ্য কুকুর আমাদের জীবনের উদ্বেগ দূর করে মানসিক শান্তি বহাল করতে ভীষণ উপযোগী। দেখা গেছে যে একটা পরিচিত কুকুরকে আদর করলে আমাদের শরীরের উত্তেজক পেশীগুলোকে শান্ত করে রক্তচাপ,হৃৎস্পন্দনের গতি , এবং শ্বাস- প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে। ওয়াসিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে একটা পোষ্য কুকুরকে মাত্র দশ মিনিট আদর করলে আমাদের শরীরের কর্টিসল নামক হরমোনের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। এই হরমোন মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত উপযোগী।

কুকুর আমাদের জীবনের মানসিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে অনেক সাহায্য করতে পারে। আমেরিকায় পারডু ইউনিভার্সিটির পশু ঔষধি মহাবিদ্যালয়ের এক গবেষণায় জানা গেছে যে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসর্ডার রোগে আক্রান্ত সৈনিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক সারমেয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

2019 সালে যুক্তরাজ্যে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে একজন কুকুর পোষক মানুষ অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় প্রতিদিন প্রায় চারগুন কায়িক শ্রম করে থাকে। একজন কুকুর পোষক মানুষ প্রতি সপ্তাহে অন্তত 300 মিনিট হাঁটে, যেখানে একজন সাধারণ মানুষ সপ্তাহে 100 মিনিটের বেশি হাঁটে না।

পোষ্য কুকুরের উপস্থিতিতে মানুষের চেহারা বেশি আকর্ষণীয় লাগে। একাধিক সার্ভেতে জনসাধারণদের মানুষের ফটো পছন্দ করতে বলা হয়েছিল। সেই সার্ভে থেকে জানা যায় যে পোষ্য কুকুরের সাথে তোলা ফটোতে মানুষকে বেশি শান্ত ও সুখী লাগে।

পোষ্য কুকুর আমাদের সবাইকে সামাজিক হতে সাহায্য করে। পোষ্য কুকুরকে সাথে নিয়ে হাঁটা আমাদেরকে অন্য লোকজনের সাথে পরিচয় এবং কথাবার্তা শুরুর সুযোগ করে দেয়। গবেষণায় জানা গেছে যে প্রায় 40 শতাংশ কুকুর পোষক মানুষ সহজেই নূতন লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করতে পারে। আমাদের পোষ্য কুকুর অপরিচিত লোকজনের সাথে পরিচয় ও নূতন বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের কামিংস স্কুল অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে যেসব মানুষ তাদের পোষ্যকে খুব ভালোবাসে, তারা বেশিরভাগই অন্য লোকজন এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা পছন্দ করে।

কুকুরের মুখচ্ছবি, বিশেষত ওদের বড় বড় চোখ এবং বড় ঝোলা কান, আমাদের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। ওদের মায়াবী চেহারা মানুষের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত পরিচর্যার আবেগ ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। সেই জন্য কুকুর ছানার প্রতি মানুষের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

পোষ্য কুকুর দেখেই আমাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যায়। 2009 সালে জাপানের এক গবেষণায় জানা গেছে যে পোষ্য কুকুরের চোখের দিকে স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকালে আমাদের শরীরের অক্সিটোসিন (আপত্য স্নেহ) হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। কুকুর পোষার অন্যান্য উপকারিতা ছাড়াও, পোষ্য কুকুর আমাদের মেজাজকে স্বাভাবিকভাবে তরতাজা রাখতে সাহায্য করে। । 2017 সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের বিষণ্ণতা অনেকাংশে কম করতে পারে তাদের পোষ্য কুকুর।

বয়স্ক মানুষের জীবনে পোষ্য কুকুরের অনেক সদর্থক ভূমিকা আছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে বয়স্ক মানুষের মানসিক রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিত্সায় গৃহপোষ্য সম্বন্ধীয় চিকিৎসা পদ্ধতি মানসিক এবং বৌদ্ধিক উৎকর্ষ প্রদানে সাহায্য করতে পারে। আরেকটা গবেষণায় দেখা গেছে যে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত বয়স্ক মানুষের অল্পে উত্তেজিত হবার আচরনকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমাতে পারে পোষ্য কুকুর।

আমাদের জীবনের কঠিন সময়ে পোষ্য কুকুর আমাদের যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সমর্থন দেয়, তার মূল্য অপরিসীম। যদিও আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের পোষ্য কুকুরের সেবা যত্ন করি, আসলে এটা পারস্পরিক। পোষ্য কুকুরও আমাদের সেবা যত্ন করে: বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটা আজ প্রমাণিত।

প্রায় তিন বছর আগে আমরা একটা কুকুর শাবক পুষতে শুরু করি। ওর নাম 'ডবি'। ইতিমধ্যেই সে আমাদের পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠেছে। কুকুর পোষার যেসব উপযোগিতার কথা উপরে লেখা হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞ। নীচে ডবি'র কয়েকটা ছবি দিলাম।

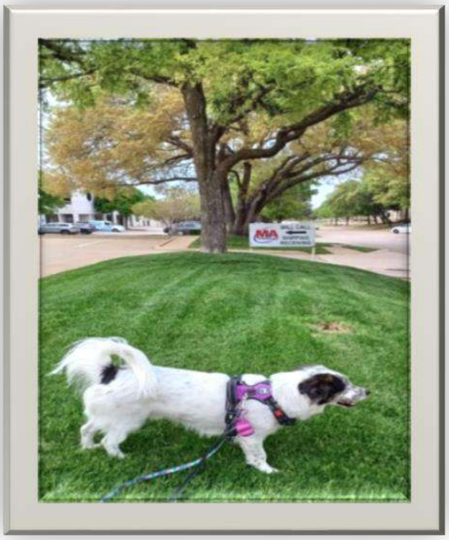

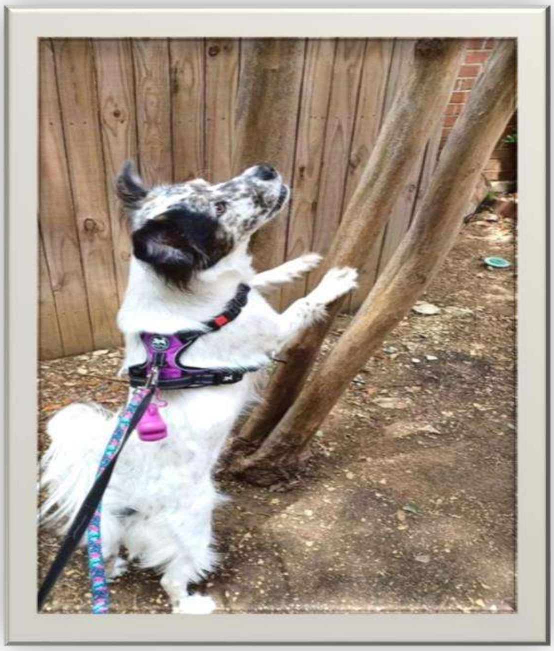

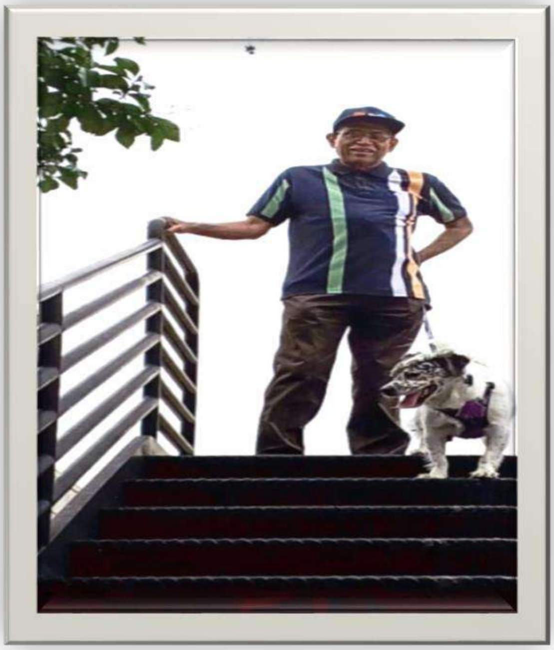

নিকাশি খালের সাধারণ সমস্যা ও তার বাস্তব মূল্যায়ন

কৃষ্ণেন্দু দাস

বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের দরুন বিভিন্ন এলাকার বেশ কিছু অংশ জলমগ্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। আবার এই জল সময়মতো নিকাশি খালগুলি থেকে নিষ্কাশিত না হওয়ার ফলেই এক ভয়াবহ সমস্যা তৈরি হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের শহরে সমস্ত খালগুলি যে সময়ে কাটা হয়েছিল তখনকার ভৌগোলিক পরিকাঠামোর সঙ্গে আজকের দিনের পরিকাঠামোর বহু অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে নিকাশি খালগুলির চরিত্রও বদলেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে সব স্থানে। উদ্‌ভুত হয়েছে বাসস্থানের সমস্যা। এই সমস্যা মেটাতে গিয়ে চাষের জমি, জলাজমি, পুকুর ভরাট করে, বিভিন্ন এলাকায় নগরায়ন যেমন বেড়েছে দ্রুত, তেমনই এসব এলাকায় অবস্থিত নিকাশি খালগুলির ওপরও চাপ পড়েছে। এই সব দ্রুত বেড়ে ওঠা বাসস্থানের ব্যবহৃত জল ও আবর্জনার বিপুল পরিমান নিকাশি খালগুলিকে যে ক্রমশ সংকুচিত করে তুলছে তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই।

নিকাশি খালগুলির একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বর্জ্য পদার্থ। নিত্য ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন ধারাতে ও পদ্ধতিতে নির্গত হয়ে এই সমস্ত নিকাশি খালি এসে পড়ে। ফলে খালগুলির তল(বেড) উঁচু হয়ে যায়। এর ফলে পলি সঞ্চিত হচ্ছে খালগুলির নীচে। বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নিকাশি ব্যবস্থা। কমে যাচ্ছে জল ধারণ ক্ষমতা। নিকাশি ব্যবস্থা খালের অনেক অংশ আছে যা দেখে বোঝা যায় না যে ওটা নিকাশি খাল না বর্জ্য পদার্থের আস্তাকুঁড় ?

বিগত দিনে নিকাশি খালগুলির যে সেকশন অর্থাৎ প্রস্থ ও উচ্চতা ছিল, খালে পলি বৃদ্ধি পাওয়াতে খালগুলির গভীরতা কমেছে। খালের দুই পাড় বেআইনি দখলদারির ফলে অস্থায়ী বাসস্থান (ঝুপড়ি তৈরি হয়েছে এবং অনেক অংশে খালগুলির প্রস্থ কমেছে। আবর্জনা দিয়ে খালের পাড় বাড়িয়ে তার ব্যবহার করছে এই বেআইনি দখলদারেরা। সে কারণে কমে গেছে খালগুলির জলধারণ ও বহন ক্ষমতা।

বেশিরভাগ খালে ভাসমান কচুরিপানা একটি বড় সমস্যা। খালে জলের প্রবাহ সঠিক থাকলে কচুরিপানা খালে অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় খালে কচুরিপানা জমে বড় হয়, এবং খালের নাব্যতা কমায়। প্রায়শই দেখা যায় খালের বেশিরভাগ অংশেই কচুরিপানা ছড়িয়ে পড়ে বড় হয় ও পচনের পর খালের পলি বৃদ্ধি ঘটায়।

বর্ষাকালে স্বাভাবিক থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের দরুন নিকাশি খালের দুই পাড়ের নিম্ন অঞ্চল জলময় হবার আশঙ্কা থাকে। দেখা যায় আগে পরিকল্পিত খালগুলি এটি বৃষ্টির জল ধারণ করতে পারতো এবং আশেপাশের পুকুর, জলাশয়, বিল ইত্যাদি বৃষ্টি জল ধারণ করে নিম্ন অঞ্চলের জলমগ্ন হওয়ার সমস্যার সমাধান করত। ইদানিং ওই সব পুকুর, বিল, ইত্যাদি বেআইনি ভাবে ভরাট হয়ে যাওয়ায় খাল সংলগ্ন অঞ্চলে জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

প্রত্যেকটি নিকাশি খালের নিজস্ব একটি জলসত্ব আছে, যা এই এলাকার বৃষ্টির জল ও বর্জ্য জল ধারণ ও বহন করে, এই জলসত্বের মধ্যে অসংখ্য নালা, ড্রেন কাঁচা বা পাকা আছে যা এই এলাকার বৃষ্টির জল ও বর্জ্য জল বহন করে নিয়ে আসে নিকাশি খালে। খালগুলি খননের সময় যে পরিমান জল ধারণ ক্ষমতার কথা ভেবে নকশা তৈরি করা হয়েছিল আজ জনসংখ্যার বিস্ফোরণে ও দ্রুত নগরায়নের ফলস্বরূপ খালগুলিতে যে জল এসে পড়েছে তার পরিকল্পনাকালীন ধার্য পরিমাপের কয়েকগুন তাই স্বাভাবিক ভাবেই খালে তা বহনে অক্ষম, উপরন্তু আর্থসামাজিক সমস্যার দরুণ খালপাড়ের উপর লোকের বসবাস খালের আয়তন আরো হ্রাস করেছে। স্বাভাবিকভাবে খালের জল ধারণ ক্ষমতা অপ্রতুল হয়ে পড়েছে।

সাধারণত বেশিরভাগ খালগুলির নিম্নপ্রবাহ নদীতে। এই নদীগুলির নাব্যতা কমে যাবার ফলে এবং নিকাশি খাল ও নদীর সংযোগস্থলে পলি জমায় স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থা বাধা পাচ্ছে। এছাড়াও নদীগুলি জোয়ার-ভাটার নদী। আগে ভাটার সময় ধরে নিকাশি খালের জল নিষ্কাশিত হতো, সংযোগস্থলে নাব্যতা কমে যাওয়ায় ইদানিং তত সময় ধরে আর জল নিষ্কাশিত হয়না। প্রায় ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম সময়ে খালি জলের জল নিষ্কাশিত হয় ফলে বহুল অংশে সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ব্যবহার হচ্ছে প্লাস্টিক/পলিথিন। ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবসায়, এমনকি গৃহস্থালিতে,হাটে বাজারে মানুষ পুরোনো প্রথায় ব্যবহৃত কাপড় ও চটের থলির পরিবর্তে সর্বত্র ব্যবহার করছে পলিথিন ব্যাগ। এই সমস্ত ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ যেহেতু পচনযোগ্য নয় তাই এর পরিবেশগত সমস্যা একটা আছেই, আবার এই সমস্ত ব্যবহৃত পলিথিন নিকাশি খালে বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে আসার ফলে দুইভাবে সমস্যা হয়।

ভাসমান প্লাস্টিক/ পলিথিন বস্তু খালের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে আবার নিমজ্জ্যমান এইসব প্লাস্টিক বস্তু যেমন খালের পলি বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে খালের পলি পরিষ্কার করার সময় বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমস্যা অনুসন্ধানে এটা বলা যায় যে, এর সমাধানের লক্ষ্যে যেমন আছে প্রযুক্তিগত দিক আবার সঙ্গে আছে জনসাধারণের সহযোগিতা ও সচেতনতার দিক। এই দুই একে অপরের পরিপূরক।

প্রয়োজন নির্দিষ্ট খালের সমস্যা সমাধানে চাই সঠিক আধুনিক পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষন, অন্যদিকে বিশেষভাবে প্রয়োজন জনসচেতনতা এবং তা করতে হবে সরকারি, বেসরকারি ও আঞ্চলিক সংগঠন গুলির সক্রিয় উদ্যোগে।

Travelogue

Eight Days in the Land of Pagodas

K K Satapathy

Myanmar or Burma, as it was previously named – is also called 'the land of Pagodas with numerous Pagodas and stupas doting across the country. British India annexed the entire country by 1886 and after a brief occupation by Japan during Second World War, Burma declared independence in 1948. Throughout the nineteenth century and early part of twelfth century, Calcutta, the British India, maintained much closed contact with Burma for political, commercial, strategic and economic reasons. Fort William in Calcutta was the center for military operations for British annexations of Burma. Burma provided manifold opportunities for middle class Bengalis in search of employment as well as business. Burma became a political haven for Bengali revolutionaries fleeing the colonial police in Bengal. It was also a place of detention of political prisoners who are deported and jailed in Burma. Sarat Chandra Chattopadhyay lived in Burma for 13 years. As a part of the group tour organized by a travel agency, I reached Yangon (earlier Rangoon) by Myanmar Airlines from Kolkata.

Myanmar is known to be most religious Buddhist country in the world in terms of number of monks in the population and proportion of income spent on religion. Burmese spend lavish amount on religious rituals. Vast majority of the population are Theravada Buddhists. In Theravada, there is no clergy; the country is punctuated by numerous monasteries with 50000 nuns and 40000 monks. Most Burmese consider their duty to live like monks in a monastery studying scriptures, seeking Bhikksha (alms) at least for a week or a month or a year or two in their lifetime. Many do it when younger but age is no bar. It is a familiar scene in the early morning when one large groups of Buddhist Bhikkus (monks) in the maroon robes in perfect que and neatly line up near a house or a shop. The house owner steps out and pour rice, banana and other eatables in the bowels of the Bhikkus. The Bhikkus accepted whatever was given, bowed and move on. Giving Bhikka is religious duty whole heartedly followed by the house holders of Myanmar.

Buddhist monks walking in perfect line up seeking alms

Mandalay

Next day early morning we took a flight from Yangon Airport to Mandalay and reached there in an hour. Mandalay is the last royal capital and second largest city of Myanmar founded in 1857 on the bank of Irrawaddy river. The British conquered Mandalay in 1885 making the end of monarchy in Myanmar. Myanmar is the country's cultural capital and religious center of the country with wooden palaces and around 700 Buddhist pagodas and monasteries. On the way to Mandalay city from airport, visited Ava, the capital of ancient kingdom. There were three shifting of capitals: from14th to 18^{th} century it was at Ava; for the next 75 years it was shifted to Amarapura and finally to Mandalay. During world war2, the city was occupied by Japanese and was completely destroyed sustaining the heaviest damage during a 12-day siege in March 1945. Since the road to Ava was not good, we had to hire horse carts to proceed to visit two ancient pagodas.; some of the horse carts were driven by women. The first pagoda was Maha Aungmye Bonzan monastery built in 18^{th} century. It was the finest specimen of Myanmar architecture that time. Next was the Bageya monastery built in 18^{th} century with finest Burmese teak wood which is surviving to this time. It was made of 267 teak wood pillars 60 ft high. The traditional dress of both males and females are some kind of 'Lungi'. Ladies and children smear on their face and exposed part of the body with white pastes prepared from tree bark to keep the skin soft and cool.

Maha Aungmye Bonzan Monastery

After lunch visited one of the most important pagoda – **Mahamuni Temple** and **Pagoda –** in Amarapura, another ancient capital, south of Mandalay. Built in 1789, the Buddha image in it believed to have been made during earthly life of Siddhartha Goutam. The 13 ft tall bronze Buddha statue sits in the center of the complex and faithful's parade past pasting golden leaf (available for purchase nearby) on the body as they go. Reportedly, the Buddha's body is 6 inches thick in some places and weighs about 12 tons because of golden sheets covering it. The early morning ritual of washing the image face, brushing of teeth with sandal wood paste draws huge crowd of devotees every day. Ladies are not allowed to go inside. Just near the temple complex, the road is lined with workshops/stone carving units where carvers use power tools and abrasives to carve and polish stone Buddha images of different moods and dispositions. There were also wood and brass carvers. There were also quite a few golden colour gates on the road with typical Myanmar architecture. The next place of visit was 240-year-old **U Bein Bridge** built in 1782. It is the world's longest teak wood bridge over Taungthaman lake. Our lady guide told us Amarapura is big center for weavers. Manipuries (India) were brought here for the purpose; silk came from China.

Mahamuni Temple ***U Bein Bridge***

Following morning, crossed the Irrawaddy river on a launch and reached the Mengun village famous for its huge unfinished pagoda. Near the river beach, there was Mya Thein Tan pagoda, a white washed temple built to resemble mount Meru, the mythological center of Buddhist cosmos. The next point was Mingun bell which is about 90-ton weight, the second largest bell in the world, 14 times larger than that of St Pauls Cathedral. The main attraction, however, was seeing the ruins of pagoda – Mingun Pathtodawgyi - that was never completed having commissioned by the king Bagyidaw in 1790. Had it been finished, it would be the largest in the world. The king spent 15 year to build the unfinished structure. We returned to Mandalay and our pagoda hopping continued.

Unfinished Mingun Pathtodawgyi Pagoda ***Mingun Bell***

After lunch we went to see Golden Palace Monastery built in 1878. It was originally part of the royal palace before it moved to Mandalay. The monastery is known for its teak curving of Buddhist myths which adorn the walls and roofs. Earlier the wood was covered with gold. It was the only building that survived during Second World War in 1945. Next visit was to the

Kuthodaw Pagoda, which houses the world's largest book or Buddhist bible on 729 slabs of stone. The entire Buddhist tenets are inscribed in pali with each slab is housed in its own white stupa. The texts were copied from the ancient manuscripts written on dried palm leaf. The book is a UNESCO heritage.

Kuthodaw Pagoda ***Buddhist Tenets on Stone Slabs***

Bagan

Next morning after 6 hours of driving punctuated by a number of police/army checks arrived at Bagan, the land of Pagodas. On the way, the lady guide enlightened us the monastery systems. There are two types of monks: monks and novices. The novices have to wait for 20 years before being ordained as monks. Normally 9-10 years old boys join the monastery, but there is no age bar. There are learning centers for nuns and monks. In the Pagodas, there is a hollow core where Buddha Satues are placed; in Stupas, there are solid core and without Buddha Statue. In the Pagodas there three postures – sitting, standing and reclining. There would be different mudras as indicated by the position of hand, fingers and gestures.

Bagan is an ancient city and a UNESCO world heritage site. From 9th to 13th century, the city was the capital of Pagan Kingdom that unified the regions that would later constitute Myanmar. Over these years, 10000 temples were built of which 3126 temples have survived with nature and wars having destroyed the others. Repeated Mongol invasions toppled four century old kingdom in 1287. The collapse was followed by 250 years of political fragmentation that lasted well into the 16th century. New Bagan has been created 20 years ago moving most of the houses, shops, hotels etc. away from the architecturally sensitive ancient pagodas which are dotted with a large concentration of them in old Bagan.

Next morning, we reached the archeologically protected area with ancient Pagodas at one place. We visited Winido Group of Temples with paintings of Jatakas on the wall and footprint of the Buddha on the vault of entry. Next stop was Nyuang market which consists of both dry and wet market (perishable commodities). We wandered round the market seeing small holders selling every thing from peanut oils, vegetables to local handicrafts and consumer durables. We stopped two more pagodas: Shwezogon stupa and Ananda phaya. Shwezogon stupa is a sacred place and is believed to enshrine a bone and tooth of Goutam Buddha. The pagoda is in the form of a cone formed by five square terraces with a central solid core. There are four standing Buddha statues here.

Winido Group of Temples

Shwezogon Stupa

The Ananda Phaya is also one of the finest and most venerated temples in Bagan. The temple has well preserved paintings of the 18th century, which are displayed. There were four 9.5 meter tall Buddha statues, Jataka tale plaques/paintings as well as a copy of Buddhist footprint over which many people offer currency notes. After lunch, we had horse cart drive through the archeologically protected area. There are hundreds of ancient pagodas stupas located in short distances in ruined and damaged conditions. We reached Nyuanglatphet mound to observe sunset. One of the items local people selling in all the places is sand paintings for which Bagan is famous. Temples, frescos, Buddha's and other motifs are painstakingly drawn and painted by hand on the background of a mat of fine sand.

Archeologically protected area with numerous Pagodas

Inle

Next morning reached Heho, a small town by air from Bagan, which is the primary gateway to inle lake, another tourist attraction. Inle lake is one-hour drive from Heho. On the way visited one family run workshop producing paper from the skin of mulberry tree. The papers are used for production of shun parasols (umbrella) and other products. Entered a hilly terrain with teakwood forests on both side of the road. British made rail line still exists but not much used. The area we were travelling belong to Shun state inhabited by Shun people. Shun state borders China to the north, Laos in the east and Thailand to the south.

We reached Nyaungsawe town on the bank of the Inle lake and visited Shwe Yan Pyay monastery and pagoda, beautiful red painted teakwood building dating back to the 19th century. Inle lake is the second biggest lake in Myanmar. The lake measures 22 km long and 10 km wide and sits in a valley between two mountain ranges. There are 28 streams joining the lakes from the mountain. It is famous for floating villages and gardens with the living communities based entirely on water. The total area of the lake is 116.3 square kilometer and depth of water is about 3.7 meter.

We set off from the jetty of Nyaungsawe in small speed boats and reached the main lake area. The water was very still at that time in the morning and there are several fishermen hauling their catches. The unique feature of the fishermen is that they steer their one-man boats with characteristic rowing style wrapping one leg around the oar. This one-legged boat rowing technique can only be seen in Inle lake. We entered a village inside the lake with cluster of wooden houses built on the wooden stilts. There are houses, restaurants, handicraft centers and markets etc., all in the midst of lake. One needs canoes to come out of the house. The locals even grow their crops, vegetables on the lake by creating floating gardens made from floating sea wood and soil. In fact, spending a night or two at stilt houses are the main tourist attraction of the lake.

Floating Market on Inle Lake

In the floating market on long tail canoes, everything was on sale – rice, meat and vegetables to household goods. There are quite a few pagodas in the lake. We visited most famous religious site, Phaung Dawoo pagoda. It was founded 800 years back as wooden structure. It was given permanent structure in 1951. The pagoda houses five sacred Buddha statues shimmering from layers of gold leaf given by devotees. We had lunch in a restaurant inside the lake complex. and we also visited two handicraft centers: one producing famous Burma cheroot and another lotus silk, cotton weaving center. We returned to the bank of the lake and checked into a hotel.

Phaung Dawoo Pagoda on Inle Lake

Yangon

Next day reached Yangon from Heho airport by flight which took about 1 hour 15 minutes. We paid a visit to the huge reclining Buddha built in 1966-77. The main attraction in Yangon is however, Shwedagon pagoda complex, the biggest in Myanmar and is a true masterpiece. Rising to a majestic height of 99 meters and adorned with over 7000 diamonds, rubies, sapphires and other precious gems. According to legend Shwedagon was built 2580 years ago – when Buddha was alive to preserve strands of Buddha's hair. He had personally given to two merchant brothers on their own spiritual journey to India. The rulers of Okkapa (as Yangon then known) ordered the pagoda construction to preserve the relics. Nearby was the Dargah of last Mughal emperor Bahadur Sah Zafar constructed over his and his wife's graves. Bahadur Sah with his family were brought here after their arrest in Delhi in 1857 during Sipahi revolt and spent another five years in a pitiable condition. There were quite a few rare photographs displayed on the wall including his old age (he died at the age of 87) photographs along with sons and also with British officers during his captivity.

Dargah of last Mughal Emperor Bahadur Sah Zafar

With this our Myanmar tour was over and we returned Kolkata by air next day.

সম্বলপুর দর্শন

মধুমিতা দাশ

সম্বলেশ্বরী মন্দিরকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, শোনার পর থেকেই ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছিল। সুযোগ এবং সঙ্গী দুইই জুটে গেলে ফেব্রুয়ারীর এক সকালে পা বাড়ালাম ওড়িশার পশ্চিম প্রান্তে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ সম্বলপুর শহরের দিকে। শহরের অনতিদূরে চিপলিমাতে পাহাড়ের ওপর রয়েছে ঘন্টেশ্বরী মন্দির, তলায় খরস্রোতা মহানদী পাহাড়ের বুক চিরে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে অনর্গল আপন খেয়ালে।

মহানদী ওড়িশার সবচেয়ে বড়ো নদী, এর ওপর ১৯৪৭ সালে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মাটির তৈরী হিরাকুদ ড্যাম, এখানে রোপওয়ে আছে, দড়িপথে ওপরে গেলে উন্মুক্ত হয় এক বিশাল দৃশ্য, তারপর গান্ধীমিনারের ওপরে উঠলে, মিনার যখন ধীরে ধীরে ঘোরে, হিরাকুদ তখন তার সারা সম্পদ মেলে ধরে চোখের সামনে।

মা সম্বলেশ্বরী, মা দুর্গারই আর এক রূপ, সূর্য্য ডুবে গেলে, রংবেরঙের আলোর রশ্মি মন্দিরকে প্রজ্বলিত করে, এখানে লাইন দিয়ে মাকে দর্শন করতে হয়। সম্বলেশ্বরী মন্দিরের উদ্ভাবনের ইতিহাস লেজারের সাহায্যে মন্দিরের গায়ে দেখানো হয়ে থাকে।

হুমা হচ্ছে হেলানো শিবমন্দির, মন্দির সোজা করে তৈরি করা হয়েছিল, তারপর বেঁকে গেছে, মন্দির চত্বরে অবস্থিত সমস্ত ছোট ছোট মন্দিরের একই দশা, হেলে আছে। মন্দিরের পিছনে বয়ে চলা মহানদীতে অনেক মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে কেউ মাছ ধরে না, মাছ ধরে কাটতে গেলেই সব জমে শিলাপাথর।নৌকা করে খানিক দূর গেলে পাহাড়ের ওপরে এক বিশাল কালীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

পরের গন্তব্য পাতালি শ্রীক্ষেত্র, জেলা শোনপুর, কথিত আছে কালাপাহাড় যখন সব হিন্দুমন্দির ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল তখন জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামকে এই নির্জন পাহাড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি গুহাতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, পাহাড়ি রাস্তা ছোট, বড়ো নুড়িপাথরে ভর্তি, সাবধানে পা না ফেললে পিছলে যাওয়ার সম্ভবনা, ওপরে ওঠার জন্য পথের ধরে মাঝে মাঝে

মোটা দড়িবাঁধা আছে, এই নুড়ি, পাথর বিছানো পথে আমরা গুহা পর্যন্ত গিয়ে ঠাকুর দর্শন করলাম। পাহাড়ের ওপর থেকে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বড়ো মনোরম। জয় জগন্নাথ।

শোনপুরে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে মেটেকানী তারিণী মন্দির, তাই ফিরতি পথে আমরা এই মন্দিরে ঢুকলাম, ১২টা প্রায় বাজে, মায়ের ভোগের সময়, ঠাকুরের ভোগ হয়ে যাওয়ার পর আমরা শালপাতার থালা আর দোনাতে ভোগের প্রসাদ পেলাম।

এবার ফেরার পালা।সম্বলপুরের বিখ্যাত মিষ্টি সরসতিয়া। ময়দা দিয়ে তৈরী একটা মিষ্টি, একরকম গাছের ডাল জলে দিয়ে রাখলে যে নালানি টা হয়, সেই জলে ময়দা গুলে এই মিষ্টি তৈরী করা হয়।যারা বেড়াতে আসবেন তারা মিষ্টি নিতে ভুলে গেলেও সম্বলপুরী শাড়ী কিংবা ওইরকম কিছু কিনতে যেন ভুল না হয়।

কলকাতা থেকে আসা ট্রেন সম্বলপুর সকালবেলা পৌঁছায়, ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের কাছে কোনো একটা হোটেলে মালপত্র রেখে, অনায়াসে দুদিনে ঘুরে নেওয়া যায় এই সুন্দর শহর।

মধুপুর - গিরিডি - দেওঘর ভ্রমণ

বিনয় কুমার সাহা

গতবছর মার্চের ২৪ তারিখে ঘড়িতে তখন সকাল ৮.০০ সিগন্যালের সবুজ সংকেত ও গার্ডের হুইসেলের সাথে হাওড়া স্টেশন ছাড়লো হাওড়া - পূর্বা এক্সপ্রেস। শুরু হল আমাদের যাত্রা। আমাদের কোচ ছিল এসি থ্রি টায়ার এবং আমার সঙ্গি ছিলেন ড: কে কে সতপতি, সুমিত সরকার এবং সুব্রত পাল। সকালের ট্রেন তাই কালবিলম্ব না করে ট্রেনের প্যান্টি কার থেকে ব্রেকফাস্টটা নিয়ে নিলাম। আমার মতে মধুপুর যাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই বেস্ট ট্রেন। আমরা মধুপুর স্টেশনে পৌঁছলাম । একটা টোটো পেয়ে গেলাম সোজা পৌঁছে গেলাম হোটেল ওয়েস্ট ভিউ।

হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না তাই স্নান সেরে বেড়িয়ে পড়লাম খাওয়ার উদ্দেশ্যে। যে টোটো করে আমরা হোটেলে এসেছিলাম ওকেই ঠিক করে নিলাম যে খাওয়ার পরে কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখব। প্রথম দিন : দুপুর ২টোয় টোটো স্টার্ট দিল।আজ শুধু মধুপুর ঘুরবো। পথে বাঙালিদের বানানো অনেক পুরানো দিনের বেশ কিছু বাড়ি দেখলাম। বেশিরভাগ বাড়িই অবশ্য ভগ্নপ্রায় তবে এর মধ্যে কয়েকটা সরকারি অফিস বা কলেজে পরিণত হয়েছে। প্রথমেই কপিল আশ্রম ঘুরে দেখলাম। তারপর অষ্ঠ ধাতুর দূর্গা, বাবা মন্দির, বালাজি ব্রহ্মচারী আশ্রম ঘুরে আমরা পথরোল কালিবাড়ি পৌঁছলাম ।

এখানে স্থানীয় পুরোহিতদের টানাটানি আছে, পুজো দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে এদের সরাসরি এড়িয়ে চলবেন।মূল মন্দিরের পাশে অনেকগুলো মন্দির আছে, এগুলো শিব, গণেশ সহ অন্যান্য দেব দেবীর। রাত ৮.০০ তাই ডিনার টা সেরেই হোটেলে ঢুকব কিন্তু দুপুরের খাওয়া টা ঠিক জুতসই ছিল না তাই ঠিক হলো একটা ভালো হোটেলে ডিনার হবে এবং এক দোকানে জিগ্যেস করে হোটেল অদিতি ইনে ডিনার করে হোটেলে পৌছলাম।

দ্বিতীয় দিন : সকাল বেলায় স্নান সেরে একটু ফ্রেশ হয়ে লাগোয়া বাগানে ঘুরে কিছু সেলফিতুললাম সাথে চাক্ষুষ করলাম গ্রামবাংলার বহু চেনা পাখি যা আজকাল আমাদের এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না।আজকের গন্তব্য ঊস্রি ফলস্ আর খণ্ডলী পাহাড় দেখে দেওঘরে গিয়ে দুই দিন থাকা।

আজকের রুট খুব দীর্ঘ তাই একটা গাড়ি বুক করা হলো। সকালের ব্রেকফাস্ট চলার পথে একটা ধাবায় সেরে রাস্তার দুপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাজু, শাল আরও নাম না জানা অসংখ্য গাছ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এবং অনেকটা পথ যাওয়ার পর রাস্তার দুপাশে পড়ে থাকা বোল্ডার দেখে বুঝলাম সে আর বেশী দূরে নেই ।হঠাৎই দেখা মিলল তার নাম খন্ডলী।গাড়ির এগোনোর সাথে মনে হচ্ছিলো পাহাড়টা যেনো ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠছে । পাহাড়টি বেশ খাড়াই । মনে হয় কারা যেন বড় বড় বোল্ডারগুলকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে ।

পাদদেশে বোল্ডার কেটে বিভিন্ন পশু, মানুষ প্রভৃতির ভাস্কর্য দেখার মতন। পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছুটা সিঁড়ি পথ । এর পর ট্রেক করে উপরে উঠতে হয় । যারা ট্রেকিং ভালোবাসেন তাদের জন্য এটি বেশ আকর্ষণীয়।পাহাড়টির পাশেই খণ্ডলী পার্ক আর খণ্ডলী লেক ।

এবার গন্তব্য উস্রী ফলস্ ও উস্রী নদী।
অনেকটা জার্নি করার পর চোখে পড়ল একটা ব্রিজ আর তার নিচে প্রায় শুকনো উস্রী নদী । ড্রাইভারদাজানালেন আর মিনিট ১৫ পর আমরা পৌঁছে যাবো। গাড়ি থেকে নামতেই কানে ভেসে এলো উস্রী ফলস্ এর শব্দ । আর ধৈর্য্য ধরলনা । নিচে নামতে শুরু করলাম । কয়েকটা বোল্ডার নামার পর চোখে পড়ল সেই সুন্দরীকে, যার জন্য এতো দূর ছুটে আসা । উস্রীর স্বর্গীয় রূপে আমার বাকরুদ্ধ হবার অবস্থা। এই রূপের কাব্যিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।দুচোখ ভরে তার রূপ দেখতে লাগলাম আর ক্যামেরা বন্দী করলাম ।

চারিদিকে পড়ে আছে অসংখ্য বোল্ডার ।বর্ষার সময় নদীর জল এগুলোর উপর দিয়ে বয়ে চলে তাই উপর তল খুব মসৃণ ।একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রচুর। খুব সাবধানে আমরা ফলস্ এর কাছাকাছি গিয়ে কিছু সেলফি তুললাম। সেখানকার সৌন্দর্য্য অনির্বচনীয় । কিভাবে যে কয়েক ঘন্টা কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না ।

সবাই ক্লান্ত তাই চা ও কিছু স্নাকস খেয়ে দেওঘরের দিকে রওনা দিলাম। অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ দেওঘরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ আশ্রমে পৌছলাম।

এখানেই আমাদের দুই দিনের থাকার বন্দোবস্ত ছিল। আমরা যে যার ঘরে গিয়ে একটু ফ্রেস হয়ে সন্ধ্যা সাতটায় একটা টোটো নিয়ে বাবা বৈদ্যনাথ ধামটা দেখে নিলাম কেননা সকালে বাবার মন্দিরে খুব ভীড় থাকে ।

বাবা ধাম সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই।মূল মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকে মা পার্বতীর মন্দির চারিদিকে বিভিন্ন দেব দেবীর অসংখ্য মন্দির।ওখান থেকে ফিরে রাত নয়টায় ডিনার করলাম। তৃতীয় দিন :প্রথমে গেলাম নলাক্ষ মন্দির ।পাথর নির্মিত সুন্দর কারুকার্য বিশিষ্ট মন্দির ।
এখানে গোপালের বাস। মন্দির নির্মাতারএকটা মূর্তি উপরে ওঠার সিঁড়ির কাছেই আছে। শোনা যায় তথকালীন সময় এই মন্দির নির্মাণে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল তাই মন্দিরের এই নাম। মন্দিরের ভিতরে ফটো তোলা নিষেধ ।

এবার গেলাম শ্রী শ্রী অনুকুল ঠাকুরের আশ্রমে, ভিতরে একটা শান্তিময় পরিবেশ ।চারিদিকে ঠাকুরের বাণী লেখা । এরপর নন্দন পাহাড় ঘুরে ত্রিকুট পাহাড়ে এসে পৌছলাম। তিনটি বড়ো মাপের পাহাড় পাশাপাশি অবস্থিত।তিনটি পাহাড় যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর রূপে কল্পনা করে স্থানীয় মানুষ জন।বিষ্ণু অর্থাত্ মাঝের পাহাড়ে ওঠার ব্যবস্থা ট্রেক করে অথবা রোপওয়ে করে উঠতে হয়। ট্রেক করে উঠতে গেলে প্রায় সারাদিন লেগে যাবে। আমরা কয়েকটি সিড়ি ওঠার পর একটা মন্দির পাই ওটা দেখে আমরা নিচে নেমে এলাম।
কথিত আছে রাবণ যখন সীতা মাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার পথে এই পাহাড়ে অবতরণ করেছিলেন । পাহাড়ের দুটো স্থানে দুটো গর্তের মতো চিহ্ন আছে এগুলি নাকি রাবণের পায়ের ছাপ এবং 30 ফুট গভীর একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা আছে । রাবণ এখানে ধ্যান করেছিলেন ।

এবার আমাদের গাড়ি ছুটতে শুরু করল বাবা বাসুকিনাথ ধামের দিকে। ওখানেও প্রচুর ভিড় ছিল তবে বাবার দয়ায় মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে ও বাবার মাথায় ফুল ও বেলপাতা দেবার সুযোগ ও পেয়ে গেলাম। এবার শেষ গন্তব্য হলো তপোবনের দিকে । নিচ থেকেই মন্দির দর্শন করে একটা চায়ের দোকানে বসে কিছুটা রেস্ট নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম। পরেরদিন ফেরা তাই ডিনার সেরে যে যার ঘরে ফিরে গেলাম।

অবশেষে দেওঘর কে বিদায় জানিয়ে সকাল ন'টা কুড়ির জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়লাম। ট্রেনের নির্ধারিত সিটে বসে চোখ বন্ধ করে সমগ্র ট্যুরের এর স্মৃতি মন্থন করতে করতে ফিরতে লাগলাম।

খন্ডলী লেক

পথরোল কালিবাড়ি

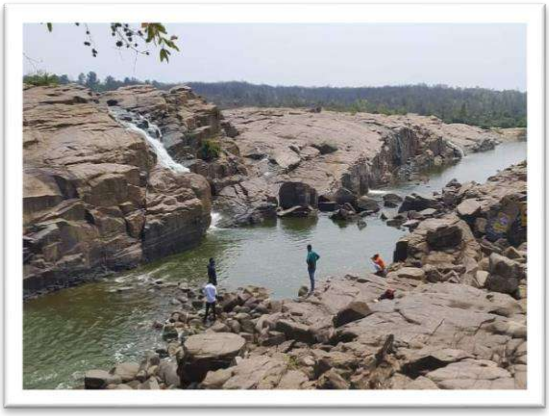

নলাক্ষ মন্দির

উর্সী নদী

Forgetfulness

Supratim Pal

Forgetfulness! Is it a virtue or vice?
Let’s there be a debate, is n’t it nice?
One of the contestents says,
It is a virtue to forget those who hearts you.
Suppose, you lost a lot in race,
And further you don’t want to race,
Forgetfulness can give you immense pleasure
The unique joy, you enjoy, to quote is endless
Being unsuccessful in examination,
Will you leave your determination?
Forgetfulness can be at your resque,
Provided you try again to come out of fatigue.
Success will embrace you, being first in queue
Unfortunately, suppose you have been bitten for no reason
Don’t be angry, to burn your finger,
Not rising to the occasion does n’t mean you are coward.
You are playing the life game forward.
Forgetfulness will be your friend in need,
Otherwise, the fight will continue indefinitely
So forgetful is my spouse,
That you can’t ever imagine.
Let’s her name be printed on Greenwich book
She is blessed with this virtue

Does she forget everything, except her name?
Does she forget and forgive for deeds
That you should never intended to do these indeed.
The opponent stands up and says,
Forgetfulness is a virtue my guys,
In case of theft, and loosing your hard-earn money,
Forgetting, once more, begets chances of loosing honey
Thus forgetfulness is a vice,
Better break its manufacturing dice.
The pain of failure, if overlooked
For forgetfulness is endless.
Imagine, being present in the platform
You forget to enter the train for your journey,
Don't you have to pay a lot for your forgetfulness?
Thus it is a unique vice,
Should it be adopted by mice like you?
Then it's fine.
If you forget, being beaten black and blue,
The chances that your opponent gets the clue,
Of your weakness, being more cruel,
Better, to act strong and finish in real
Imagine, your wife is not forgetful as you are,
The promise you made to her, being a fool,
Remains unattended, the fury and displeasure,
Will be poured on you like cats and dogs.
And, I am ashamed to say you will be a dog indeed.
So, let's admit forgetfulness is a vice and funny deed.
You may try to forget, but think at least thrice,

Remarked the judge, after listening from both sides,

I don’t find any point to support either of you.

Neuroscientists have started to uncover the mechanism of forgetting. Brain cells called “neurons” form electrochemical connections with each other.Memories are encoded by changes in the strength of these connections. The streangth of the connection between any two neurons is depended on -

1) The number of electrochemical contacts(synaps) between two neurons and
2) The strength of each synps. In this context, the phenomenan of forgetting is when we try to retrieve a stored memory and fail.

   This could be due to deficit in the formation of memory, the integrity of the stored memory simply our ability to retrieve it. Thereby, forgetting has a double possible description as an epistemic vice and as an epistemic virtue.

স্মৃতি কথা

এক রোমাঞ্চকর নৌকা অভিযান

তনুরূপা কুন্ডু

আমার বয়স তখন 5 কিম্বা 6 বছর। আমার বাবা আমাদের দুই ভাইবোন আর ছোটো কাকাকে নিয়ে প্রত্যেক রবিবার ঘুরতে বেরোতেন। আর সঙ্গে থাকতো বাবার স্বচালিত দুই চাকার যান, মানে সাইকেল। তিনজনকে তিনি ওই সাইকেলে তুলে নিতেন কিভাবে? সামনের রডে আমরা দুই ভাইবোন। আর ছোটো কাকাকে পিছনের ক্যারিয়ারে। ছোটো কাকার বেশ মজা ছিল, সে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারতো। কিন্তু আমরা দুজনে বেশ কষ্টেশিষ্টেই আঁটতাম। যেহেতু এই অভিযান বেশ রোমাঞ্চকর হতো তাই এই কষ্ট মেনে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়তাম।

সেদিনের অভিযানে আমাদের সঙ্গে সাইকেল ছিল না কারন সেদিনের অভিযান ছিলো জলঙ্গী নদীতে। আমাদের বাড়ি থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে জলঙ্গি নদী। সেইসময় বাবা রোজ নদীতে সাঁতার কাটতেন। আমরা নদীর পাড়ে বসে বাবার সাঁতার কাটা দেখতাম। বাবা ভালো সাঁতারু হলেও আমরা দুই ভাইবোন কেউই নদীতে ডুব পর্যন্ত দিতে পারতাম না। দুজনেরই জলে খুব ভীতি, যা এখনও পর্যন্ত কাটাতে পারিনি। যাইহোক বাবার সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে উল্টো পাড়ের সবুজ ক্ষেতে চোখ যেতো। নদী তখন বেশ চওড়া আর গভীর ছিল। তাই নদীর উল্টো পাড়কে মনে হতো অন্য জগৎ।

সেদিন ঠিক হল আমরা সেই কল্পনায় দেখা অন্য জগতের অভিযানে যাব। যথারীতি বিকেল নাগাদ আমরা চারজনে নদীর ধারে এসে নৌকার খোঁজ করতে লাগলাম। এক মাঝি আমাদের নৌকাতে ওপারে পৌছে দিল। সেখানে গিয়ে তো আমরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা। কচি কচি মটরশুটিতে ক্ষেত একেবারে ভরে আছে। আর যতদূর চোখ যাচ্ছে একেবারে সবুজ চাদরে ঢাকা। এ পাড়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা প্রায় নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। কতদূর যে চলে এসেছি জানি না। ফেরার কথা যখন মনে পড়ল তখন সূর্য অস্ত গেছে। নদীর ধারে পৌঁছতে আমাদের সন্ধে সাতটা বা তারও বেশি হয়ে গেছে। পাড়ে এসে দেখি কোথাও মাঝি নেই শুধু একটা নৌকা বাঁধা আছে। অনেকক্ষন ধরে চিৎকার করে মাঝির জন্য ডাকাডাকি চলল।কিন্তু মাঝির কোনো খবর পাওয়া গেল না। বাবা তখন স্থির করলেন আমাদের তিনজনকে নৌকায় বসিয়ে নিজেই বৈঠা বেয়ে ওপারে নিয়ে যাবেন। অবশ্য তাছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। খুব অন্ধকার।ওপারের বৈদুতিক আলোগুলো শুধু একটু ক্ষীণ আলো দেখাচ্ছে আর বাবা অনভ্যস্থ হাতে বৈঠা টেনে চলেছেন। নৌকাতে বসে ভয়ে আমাদের চোখ তখনও পাড়ের আলোকে অনুসরণ করছে। কখন সেখানে পৌছাবো। যখন আমরা মাঝনদী পর্যন্ত এসে গেছি এমন সময় হঠাৎ ঝপাং করে এক আওয়াজ। দেখি বাবা নেই নৌকাতে। আমরা মাঝ নদীতে নৌকায় বসে তিন জনে ভয়ে প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছি। বাবার অনভ্যস্ত হাত টাল সামলাতে না পেরে বাবাকে সুদ্দু নৌকা থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বাবা যখন উঠে নৌকার কাছে এসে আমাদের বললেন 'ভয় পাস না তোরা, এইতো আমি আছি'।বাবার কথাতে আমাদের ধড়ে প্রাণ ফিরে এলেও জানি না তখন আমাদের কতটা ভয় দূর হয়েছিল। তবে বাবাকে পেয়ে হার্টবিট খানিকটা কমেছিল বোধহয়। বাবা তারপর আর বৈঠা না ধরে সাঁতার কাটতে কাটতে নৌকা ঠেলে আমাদের নিয়ে এপারে এলেন। বাবার জামা কাপড়তো ভিজে একাকার, সংগে ওনার জুতোও নদীতে হারিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম

রোমাঞ্চকর নৌকা অভিযানের অভিজ্ঞতা নিয়ে যেটা খানিকটা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের নৌকা অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাবা সেদিন সাহসিকতায় ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় ছিলেন। আর বাড়ি ফিরে ভেজা কাপড়ে দেখে মা আর ঠাকুমার কাছে বকা খাওয়ার অভিজ্ঞতাটা ছিল সঙ্গে ফ্রি।

ইছামতীর ধারে

মধুমিতা দাশ

বসিরহাটে আমাদের মামাবাড়ি ছিল বাসরাস্তার ওপর আশ্রমপাড়ায়, বাড়ীর পিছনে একটুকরো বাগান, তারপর ইছামতীর নদী, অবিরাম বয়ে চলত আপন খেয়ালে। নদীর ধারে একটা বড়ো পেয়ারা গাছ, ফলের ভারে সবসময় নদীর ওপর ঝুঁকে থাকত, নৌকা পাড়ের কাছে এনে মাঝিরা প্রায়ই পেয়ারা পেড়ে নিত।

রাস্তা থেকে নেমে একটু ঘাসজমি মাড়িয়ে আমরা বাড়ীতে ঢুকতাম। বাড়ীর সামনে দালান, তারপর একটা লম্বা ঘর, সার সার তক্তপোষ পাতা, তার ওপরেই ছিল আমাদের খেলা, লাফানো, পড়া এবং শোওয়া। ওর উপরেই দাদু পড়াতেন, উনি বসিরহাট হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন। লম্বা ঘরটার পিছনে ছিল একটা ছোট ঘর, কালো বর্ডার দেওয়া লাল রঙের মেঝে, দেওয়ালে ঠেসানো বড়ো আলমারী, যার সামনে কাঁচ লাগানো, পাশে ঝুলতো একটা শঙ্কর মাছের চাবুক। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের ডানদিকে ছিল রান্নাঘর, রান্নাঘরটা ছিল বেশ বড়ো, জানলার ধারে মাটির বড়ো বড়ো উনুন, শুকনো গাছের ডালপাতা দিয়ে রান্না হত , জানলা দিয়ে দেখা যেত নদী দিয়ে কতো মাল বোঝাই, যাত্রী বোঝাই নৌকা চলেছে। উনুনের ওপর বড় এয়্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটত, কাঠের পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরের মেঝেতে আমরা খেতে বসতাম, সাদা কলাই করা থালাতে ধোঁয়া ওঠা ফেনাভাত ছিল আমাদের রোজকার জলখাবার।

মামারবাড়ীর ডানদিকে ছিল চিত্তমামাদের বাড়ী, ওই বাড়ীর তিন বোন ছিল আমাদের খেলার সাথী, তার পাশে মায়ামাসীদের বাড়ী, আর একদিকে শিবেমামাদের বাড়ী, তারপর মড়াকাটা ঘর। বসিরহাট হাসপাতালের যত পোস্টমর্টেমের লাশ ওখানে কাটাছেঁড়া হতো, শিবেমামাদের বাড়ীর পিছনে ছিল বাঁশঝাড়, লম্বা লম্বা বাঁশের ঝাড়ে রাতেরবেলা হাড়, মাংসের লোভে শিয়াল, খটাস সব ঘুরে বেড়াত, ভুতের ভয়ে দিনের বেলাও কেউ ওদিক মাড়াত না।

বাথরুম ছিল বাড়ীর বাইরের দিকে, সূর্য্য ডুবে গেলে বাথরুমে যেতে গা ছমছম করত। বড়দের কাউকে সঙ্গে করে বাথরুমের দিকে গেলে, হঠাৎ হঠাৎ নদীর দিকে চোখ পড়ে যেত, চারপাশের ঝাপসা হয়ে আসা গাছপালা, বাঁশবনের মধ্যে সর-সর শব্দ, এর মধ্যে ছোটো ছোটো ঢেউ বুকে

নিয়ে নদী বয়ে চলেছে, আকাশভরা তারা, তারার মিটমিটে আলোয় মাঝে মাঝে নদীর জল চিকচিক করে উঠছে, কি এক অপার্থিব মায়ায় ভরে আছে বিশ্ব চরাচর।

রান্নাঘরের পিছনের কুলগাছে খুব মিষ্টি কুল হতো, রাঙামাসী কাঁচাপাকা কুল থেঁতো করে তেল, নুন দিয়ে মাখত, গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা চেটে চেটে কুলমাখা খেতাম, রাঙামাসী একদিন একা গাছের গুঁড়িতে বসে কুলমাখা খাচ্ছিল, কে যেন রাঙামাসিকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল, সবাই বলল ভুতে মেরেছে , মড়াকাটা ঘরের ভূতগুলো নাকি প্রায়ই এধার ওধার ঘুরে বেড়াত।

শিবেমামাদের বাড়ীর আমগাছের ডালগুলো মামাদের বাড়ীর ছাদের ওপর সবসময় নুয়ে থাকত, আমের সময়ে বড়দা ঘুলঘুলির ফাঁকে পা রেখে ছাদে উঠে আম পাড়ত, অসাবধানে আমগাছের ভাঙা ডালপালা টালির চালের ওপর পড়লেই শিবেমামার ঠাকুমা কে রে, কে রে বলে বেরিয়ে আসতেন, বড়দা ছাদের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ত, আমরা যে যেখানে পারতাম, লুকিয়ে পড়তাম। কাউকে দেখতে না পেয়ে উনি ঘরে ঢুকে যাওয়ার একটুক্ষণ পরেই আবার শুরু হয়ে যেত আমাদের আম পাড়া। বাড়ীর সামনের দিকে বারান্দার ধারে আরও একটা আমগাছ ছিল, সেই গাছের ডালে উঠে বড়দারা খালি লিলিফুল গাছের ওপর ঝাঁপ মারত, কে কতো উঁচু থেকে লাফ দিতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলত, লাফঝাঁপের ঠেলায় লিলিফুল গাছগলো কখনো সোজা হতে পারেনি, সবসময় চেপ্টে থাকত।

ইছামতী দিয়ে যখন নৌকা চলত, মাঝিরা যাত্রীদের নদীর জলে হাত দিতে মানা করত, একবার একজন হাত ডুবিয়ে বসেছিল, কিছুক্ষন পরে মাঝির নজরে আসে একটা সুতোর মত লাল রঙের রেখা নৌকোর পাশ দিয়ে চলেছে, হাত ওঠালে দেখা গেল লোকটার হাতের ছাড়তে আঙ্গুল নেই, কামটে কেটে নিয়ে গেছে, সে টেরও পায়নি কামটের দাঁতের এতই ধার। সবাই বলত ইছামতীতে অনেক কামট আছে, জলে হাত ডুবিয়ে রাখতে নেই।

গরমের ছুটিতে প্রায় একমাস আমরা মামাবাড়ী গিয়ে থাকতাম, তখন নাটক করতাম, একবার করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পূজারিণী", আমরা ছোটরা কোনো পার্ট পেতাম না। তক্তপোষ পেতে স্টেজ হত, মা মাসিদের শাড়ি বেঁধে তৈরী হতো স্ক্রীন, স্ক্রীনের ধারে বই হাতে প্রম্পটার ও থাকত, পার্ট ভুলে গেলে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। নাটক জমে উঠেছে, বুদ্ধের সেবিকা শ্রীমতি যখন প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করে প্রণাম করছিল, জল্লাদ খাঁড়া হাতে স্টেজের মধ্যে ঢুকে এক কোপ মেরেছিল শ্রীমতীর গলায়, মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে, কপালে লাল বড়ো সিঁদুরের টিপ্, টিনের খাঁড়া হাতে রাঙাদা হয়েছিল জল্লাদ, শ্রীমতীর তখন চিৎ হয়ে শুয়ে, হাত পা এলিয়ে মরে যাওয়ার কথা, খাঁড়ার কোপ খেয়ে সে মরার ভান ও করেছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়

এখানে ওর একটা নাচের কথা ছিল, সাতদিন ধরে টানা রিহার্সাল দিয়েছে, সুতরাং প্রবল হাসি আর হাততালির মধ্যে ভূপতিত শ্রীমতি কাপড়- টাপড় ঝেড়ে ফেলে নাচ শুরু করে দিল, বেচারা জল্লাদ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্টেজ ছেড়ে বাইরে। নাচটা শেষ করে সন্তুষ্ট শ্রীমতি আবার হাত পা এলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ফটাফট হাততালি, প্রচুর হাসি হট্টগোলে পূজারিণী নাটকের এখানেই পরিসমাপ্তি।

বসিরহাট পার্কের ধারে ইছামতীর নদীর ঢালে একটা কুমির শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল, বালতি হাতে পাড়ার এক বৌ যাচ্ছিল জল আনতে, অন্যমনস্ক হয়ে খানিকটা নদীর ঢাল বেয়ে নেমেছিল, দেখে কি একটা গাছের গুঁড়ির মতন পড়ে আছে, আর একটু এগোতেই কুমীর দেখে ভয়ে তার হাত থেকে বালতি খসে পড়ল, পড়বি তো পড় বালতি গিয়ে পড়ল কুমীরের গায়ে, একলাফে বালতি মুখে নিয়ে কুমীর মাঝনদীতে, বউটি কোনোমতে পাড়ে উঠে আসে, কুমীরের কথা জেনে অনেকদিন আর এখানে কেউ নদীতে নামত না।

বাড়ীর সামনে বাস রাস্তার ওপারে ছিল গোডাউন, তার পাশ দিয়ে ছিল কামারপুকুর যাওয়ার রাস্তা, রাস্তার ধারে ছিল একটা বিশাল বকুল গাছ, ফুলের গন্ধে গাছতলা ম ম করত। সেই রাস্তা দিয়ে আমরা পুকুরে স্নান করতে যেতাম, সারাদিন মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো, সন্ধ্যে হলে তক্তপোষের ওপর বই নিয়ে বসতে না বসতেই চোখজুড়ে নামত ঘুম, তখন বাঁশের মাচার ওপর লেপ, কম্বলের পুঁটলির ভিতর থেকে তক্ষক ডেকে উঠত মাঝে মাঝে।

পার্কের পাশে ইছামতীর একটা ছোট্ট খাঁড়ি ছিল, একবার ছুটিতে মামাবাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখি ওই খাঁড়িতে একটা সবুজরঙের ছৈ দেওয়া নৌকা, বোধহয় জোয়ারের সময় নদীতে ভেসে এসেছিল, ভাঁটার সময় খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে আটকে গেছে, নৌকাটিতে কোনো লোক ছিল না, কোথেকে এটা এসেছে কেউ জানেনা, তখন সবে বারমুডা ট্র্যাংগেল পড়েছি, কল্পনা করতাম হয়ত বা নৌকাটা ঐরকম কোনো জায়গায় গিয়ে পড়েছিল, তারপর অনেক অনেকদিন পর হঠাৎ ওখান থেকে বেরিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে পড়েছে।

পড়াশোনার চাপ বাড়ছিল, মামাবাড়ী যাওয়া, এবং থাকা, দুইয়েরই আধিক্য ক্রমশ কমে আসছিল, একদিন জানলাম ওটা মামাদের ভাড়াবাড়ী ছিল, মামারা নদীর ধারের ওই বাড়ী ছেড়ে আর একটু ভিতরের দিকে চলে গেল। তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে মামারা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাড়ী করে চলে গেল। বসিরহাটে আর যাওয়া হয়ে উঠত না, মা খুব যেতে চাইত, তাই প্রায় তিরিশ কি চল্লিশ বছর পেরিয়ে একদিন আমরা পা রাখলাম বসিরহাটে, পুরোনো মামারবাড়ীর সামনে, প্রথমে তো চিনতেই পারছিলাম না, মাসতুতো ভাই সাহায্য করল, বাড়িটা হয়ে গেছে দেশলাই

কৌটোর মতন, কোনোদিক দিয়ে বাড়ীর পিছনে যাওয়া যায় না, মায়ামাসীদের বাড়ীর ফাঁক ফোকর দিয়ে ইছামতিকে দেখলাম, নদী বয়ে চলেছে ঠিক ই, কিন্তু না আছে সেই উচ্ছলতা, না আছে সেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, কে জানে কামট আর কুমিরের দল এখনও নদীর বুকে ঘাপটি মেরে থাকে কিনা! নদী হয়ত একইরকম আছে খালি আমার দেখার চোখ গেছে বদলে, যে নদী তার রহস্যে ভরা বিশালতা, প্রাণোচ্ছলতা নিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল আমার ছোটোবেলাকে, সমৃদ্ধ করেছিল আমার মননশক্তিকে, সে আজ কেমন শান্তভাবে বয়ে চলেছে। অনভিজ্ঞ ছোটবেলায় যা মনে হত অপূর্ব সুন্দর, অভিজ্ঞ বড়বেলায় তাই মনে হয় অতি সাধারণ, ফেলে আসা ভালোলাগার জায়গায় তাই কখনো ফিরে যেতে নেই, ভালোলাগা কমে যায়, মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ছোটবেলায় দেখা ইছামতী বেঁচে থাক আমার মনের গভীরে, হৃদয়কুঠুরিতে!

দেরাদুনে দেড়বছর

চৈতালি দত্ত

শিরোনামটি দেখে বিভ্রান্ত হবেন না !!আমি আসলে দেড় বছরের বেশি সময়ই এই উত্তরাখণ্ডের শৈল শহরটিতে কাটাচ্ছি। কিন্তু বলতে চাইছি প্রথম দেড় বছরের কথা। লকডাউন পিরিয়ড সবে কেটেছে -- পুত্রের ঘরে বসে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম " পর্যায়ের অবসান। এই রকম ঘরবন্দি দশা এক ধরণের মানসিক জাড্য তৈরি হতে সাহায্য করে। তার থেকে মুক্তির একটা সম্ভবনা দেখা দিল। পুত্র যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত -- তারা ডাক দিল " এসো , অবিলম্বে সশরীরে কাজে যোগ দাও। " ব্যাস, শুরু হয়ে গেল বাঁধাছাঁদা। বন্দরের কাল হল শেষ, যাত্রা কর যাত্রীদল, এসেছে আদেশ।

দেরাদুন অবশ্য আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়, অনেক বছর আগে দেরাদুন, মুসৌরি ঘুরেছিলাম। কিন্তু তারপর কেটে গেছে বহুদিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতি সবই পাল্টায়। প্লেনে চড়লাম যখন, তখন মনে মনে একটু সংশয় কাজ করছিল।

পৌঁছিয়ে দেখি, দেরাদুন আদ্যন্ত পাল্টে গেছে --- ঠিক যেন ঝাঁ চকচকে একটি ছোট্ট শহর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সাজানো গোছানো দোকান-পাট, রাস্তাঘাটে এত আলো কলকাতাকে মনে পড়িয়ে দেয়। বুঝলাম আধুনিকতার ঝোড়ো হাওয়া একে ভালোমতোই পাল্টে দিয়েছে। যাই হোক, দিন কয়েক পুত্রের ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে কাটিয়ে এলাম আমাদের জন্য ভাড়া করা বাড়িটিতে - এই বাড়িটি দেরাদুনের পণ্ডিতবাড়ি অঞ্চলে। এই এলাকাটিও ছিমছাম, শান্ত এবং ভদ্র পরিবেশ। বাড়িটি দুতলা - এক তলাতে থাকেন বাড়ির মালিক সপরিবারে আর দোতলায় থাকতে শুরু করলাম আমি এবং আমার পুত্র। আর এই দোতলাতে ঘরগুলির লাগোয়া একটি প্রশস্ত ছাদ। দেখলে পছন্দ হতে বাধ্য। খালি একটাই অপছন্দের বিষয় হল এই বাড়ির মূল সিঁড়িটি - সেটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

যাইহোক, থাকতে শুরু করলাম বাড়িতেই। ক্রমশঃ দেখলাম প্রতিবেশীরা অত্যন্ত ভালো। আমাদের যারা প্রতিবেশী ছিলেন তাঁদের মধ্যে যে দুটি বাড়ি আমাদের বাড়ির দুপাশে ছিল, সেই বাড়ির অধিবাসীরা তো বটেই,সামনে যে বাড়ি দুটি তার বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচিত হতে একটুও দেরী হলোনা। সেই পরিচয় ক্রমশ গভীর হৃদ্যতায় রূপান্তরিত হল। কখন কখন কোন বাড়ীর গৃহিনী গল্প করতে আসতেন। একটিই প্রতিবন্ধকতা ছিল। তা হল আমার সীমিত হিন্দি ভাষা জ্ঞান। তা সত্বেও, মনে হয় মানুষের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ শুধু ভাষাতে নয়,- তার অভিব্যক্তি, আচরণে প্রকাশ পায়। এই পাড়াতে আমরা খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন।

তারপর একদিন, তখন শীতকাল। আমি ছাদে বেড়াচ্ছিলাম দুপুরবেলা, খাওয়ার পরে। কবোষ্ণ রোদ্দুরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম - ফোনটা ছিল ঘরেই। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল; তারপর বাজতেই থাকল ক্রমাগত। আমার মনে হল এতবার যখন ফোন করছে, নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কিছু - ছুটে ধরতে গেলাম! ছাদ থেকে ঘরে ঢোকার যে দরজা - তাতে চৌকাঠ ছিল। খুব উঁচু নয়, তবু তাতেই বেধে পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে অনুভব করলাম আমার শরীরে গুরুতর কোনো আঘাত লেগেছে , কারণ আমি কিছুতেই উঠতে পারছি না। কাউকে ডাকবো যে ফোন না থাকায় তাও সম্ভব নয়। সেই সময় ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মত ছাদে উঠে এলেন বাড়ির মালিক -- আমাদের জরুরী কিছু ডকুমেন্ট এসেছিল, পিওন নিচে রেখে গিয়েছিল, সেগুলি পৌঁছে দিতে। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে তিনি তার স্ত্রীকে ডাকলেন। সামনের বাড়ির ছেলেটি এইসব হৈ চৈ শুনে ছুটে এল - কিন্তু আমাকে দু'তিনজন মিলে চেষ্টা করেও ওঠাতে পারছিল না. আমি তখন সামনের বাড়ির ছেলেটিকে ঘরে আমার যে ফোনটা ছিল সেটা থেকে আমার ছেলেকে ফোন করতে বলি। আধঘন্টার মধ্যে আমার ছেলে চলে এল। তারপর পাড়ার ডাক্তার কে ডাকা হল। তিনি এক্স-রে করতে বললেন। পরের দিন আমি ভর্তি হলাম ম্যাক্স হাসপাতালে। কারণ এক্স-রে দেখে ডাক্তাররা বললেন আমার হাড় ভেঙে গেছে। অতঃপর অপারেশন হল। তারও প্রায় ৫/৬ দিন পরে হাসপাতাল থেকে মুক্তি

পেয়ে বাড়ি ফিরলাম। ব্যাস, হাঁটাচলা সব বন্ধ। একেবারে বিছানাবন্দী ! সেই অসহ সময়েও আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন প্রতিবেশীরা। তাঁদের সাহায্যে, সাহচর্যে আর শুভকামনায় আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম।